মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

মার্চ, ২০২৪
ফাল্গুন, ১৪৩০

সূচীপত্র

২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৪৩০/মার্চ ২০২৪

সত্যময় জীবন চাই দিব্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য		৩
যোগপথে-নিবেদনে ঈশ্বরলাভ	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
ব্রহ্মপ্রজ্ঞায় ঈশ্বর স্বতঃবিভাষিত	তুলি চ্যাটার্জী	১৫
কর্মযোগে ঈশ্বরলাভ	তানিয়া ঘোষাল	১৬
ভক্তিতেই ঈশ্বর লাভ	বুকু বসু	১৭
ব্রহ্মপথিকের ব্রহ্মবিস্তার	সায়ক ঘোষাল	১৮
গায়ত্রী মন্ত্রের সাধন উপলব্ধি	স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
শ্রী অনির্বাণ স্মৃতি সংগ্রহ	আশুরঞ্জন দেবনাথ	২০
দিব্য মানবই গড়ে তুলবে দিব্য সভ্যতা	রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

সত্যময় জীবন চাই দিব্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য

জীবন গঠনের জন্য চাই জীবনের দর্শন ও প্রত্যয়। দর্শনটি হতে হবে শুদ্ধ আর বহু ব্যাপ্ত। প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজ করছে বিপুল সব সম্ভাবনারাজি। জীবনের সম্ভাবনাসমূহ যখন হয়ে ওঠে কার্যকরী, ক্রমে গড়ে ওঠে ব্যাপ্তি। একজন মানুষের জীবন তখন হয়ে ওঠে বহুজনের আশ্রয়দায়ী। একজনের মধ্যে তেমনি রয়েছে উদ্যোগ-অধ্যাবসায়ের প্রসঙ্গ। বৈদিক ঋষিগণ স্বতঃই চেয়েছেন সত্য-জ্ঞান- কর্মের সমন্বয় জীবনমাঝে। সামবেদের ঋষিগণ এরই সঙ্গে প্রসঙ্গ আনলেন ভক্তির। ভক্তির সংযোগে ভগবত্তার বিষয় হয়ে উঠল ভাব ও নিবেদনের। ভক্তির অনিবার্য অঙ্গ হল শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভালবাসা। এই সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ভগবৎ প্রেম। ক্রমান্বয়ে ভক্ত ও ভগবান উভয়ে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের আপনত্বে একে অপরকে আবৃত করে দেন। পরস্পরের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা-ভালবাসায় নিত্য সত্যকে জীবনে আলিঙ্গন করে নিয়ে আসেন ভক্তির পসারে উভয়ই। এমন এক বিকাশের পর্বেই ভগবৎ উপলব্ধির শীর্ষে পৌঁছে যান ভক্ত। ভগবৎ উপলব্ধির এই গভীর পর্বেই তিনি জানতে পারেন, বুঝতে পারেন, জীবনের সার অনুভব করতে মৌল দৃষ্টিভঙ্গি ভোগ নয়, চাই ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভিত্তি। ঋষির আশ্রমে বারো বছরব্যাপী ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবনশৈলী অনুধাবনের পর যখন ঋষির বিচারে শিষ্য বা ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে; তখন তার সমাবর্তনে ডাক আসে। সমাবর্তনে ঋষি ঘোষণা করবেন ঐ ছাত্রের কৃতিত্ব। সে যদি সফল তবে তার সমাবর্তনে ঋষি ঘোষণাকরবেন যে ছাত্রটি এখন ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করেছে। ছাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী বলেই স্বীকৃত হল। এর ফলে তার পক্ষে কাজ খুঁজে নেবার পথ খুলে গেল। জ্ঞান-অর্জনের পর সে বিভিন্ন রাজা বা বিখ্যাত ব্যক্তি বা উদ্যোগীর কাছে গিয়ে পরামর্শদাতার কাজ পাবেন। এবার কর্মরত ও উপার্জনক্ষম যুবক ঋষি বিবাহ করবেন এবং সমাজের মধ্যে শুভ সম্পাদনকারী পরিবার গড়ে তুলবেন।

The accumulation of oxygen was one of the most critical transitions in this planet's history-long after life itself evolved – but the story about how earth came to have oxygen in its atmosphere is complex. One chapter in that story is evolution of the microbial nanomachines was necessary for the production of oxygen, in and of itself it was not sufficient to allow the gas to become a major component of earth's atmosphere. The oxygenation of earth had became a gas on earth because of tectonics and the burial of the bodies of dead microbes in rocks. Once oxygen appeared in the atmosphere, it had a profound influence on the evolution of the microbes themselves and the cycles of elements that perpetuate life.

(Paul G. Falkowski, Life's Engines, How microbes made earth habitable, Princeton University Press, Princeton, 2015, p. 68.)

সমাবর্তনে যুবক ঋষি বা ছাত্রছাত্রীদের এই প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে যে ঋষির আদর্শ সে তারা নিজ জীবনে পালন করবে। যে প্রতিজ্ঞা সবার জন্য অবশ্য পালনীয় ছিল সেটি হল ঃ 'সত্যং বদ ধর্মং চর'— সত্য বাক-চিন্তা ও কর্ম এবং ধর্ম পথে জীবন যাপন করতে হবে। সত্যের পথ থেকে যেন চ্যুত না হয় কখনও, ধর্মের পথ থেকে যেন সরে না আসে কখনও। এই প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি যুবক ছাত্রছাত্রীদের জন্য ঋষির পরামর্শ ছিল সংসার জীবনে প্রবেশের। বিবাহ সম্পন্ন করে সত্য ও ধর্মের পটভূমিতে সংসার যাপন করা। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি তার সত্যময় ও ধর্মাচরণী জীবনে যখন সংসারে প্রবেশ করবে সে গড়ে তুলবে অনন্য সমাজ। এই সমাজ শুভ সম্পাদনকারী। ঋষিগণ সর্বদাই চেয়েছেন সমাজের স্বাভাবিক প্রগতি। এই হল স্বাভাবিক প্রগতি। এই স্বাভাবিক প্রগতির জন্য চাই শুভ সম্পাদনকারী ব্যক্তির প্রসার। জগতের পটভূমিতেই এই শুভ সম্পাদন — যার তাৎপর্য হল সৎ-ধার্মিক-চরিত্রবান-ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সমাজের কাজে হবে ব্যাপৃত। এরা যে সব উদাহরণ রচনা করবেন সমাজের সেগুলি বিশেষত্বপূর্ণ। এই ব্যক্তিগণ নবীন ঋষি। এঁদের ব্রহ্মজ্ঞান সূচনা হয়েছে। জীবনের পথে চলতে চলতে এঁদের মধ্যে ফুটে উঠবে জগৎ জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের পটভূমিতে জগৎ জ্ঞান যখন প্রকৃতই গড়ে উঠবে, সংসার-সমাজ উন্নত স্তরে বিরাজ করবে। সংসার-সমাজ গড়ে উঠবে বিশেষ-প্রত্যয়ের নিরীখে। প্রত্যয়টির মৌল কথা হল— ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যে বিশ্বময় ব্যাপ্ত সব সম্পদ ভগবানে নিহীত। এই জগৎ, এই জীবনের মূল পরিচালক ও মালিক ভগবান স্বয়ং। যে কর্ম এই ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েছে, সেটি ভগবানেরই দান। তিনিই অধীশ্বর। তিনিই জীবনের রাজা। জীবনের সব কর্ম তাঁকে উদ্দেশ্য করেই নিবেদিত। তাই জীবন দাবি করে পরিমিতি। ভোগ-লালসা-লোভ-ক্ষোভ-ঈর্ষা-বিদ্বেষ-রাগ নয়; বরং ভালবাসার তরণীতে সবাইকে আপনত্বে বিধৃত করাই জীবনের শ্রেয়। ঋষির প্রত্যয়ের জীবন সহজ-সরল স্বাভাবিক জীবন অথচ বাসনা-কামনা বিরহিত ভগবানের আশ্রয়ে মন-প্রাণ সঁপে দেওয়ার জীবন। ঋষির জীবনযাত্রা তাই বহুজনে ব্যাপ্ত। ঋষির অঙ্গীকার বহুজনের হিত ও কল্যাণ সাধন। নিজের মধ্যেকার শুভ্র, সরল, শুভ চেতনে বিধৃত ঋষির জীবনকে কেন্দ্র করে যে সমাজ সেটি প্রকৃত অর্থে এক দিব্য সমাজ। এই সমাজের সমন্বয়ে যে সভ্যতা সেটি দিব্য সভ্যতা।

—ঃঃ—

যোগপথে-নিবেদনে ঈশ্বরলাভ

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাসযোগে ঃ ন্যাস হল আত্যন্তিক নিবেদন। ভগবানে নিবেদন—নিজের অন্তরের সম্পদ আর পরিণামে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ন্যাস-যোগের উদ্দেশ্য ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করা আর এই নিবেদনের তাৎপর্যকে জীবনের নির্যাস করে নেওয়া। ন্যাসের তাৎপর্য বিরাট ও গভীর। ন্যাস এই অনন্ত ব্রহ্মের কণা হয়ে ঐ মহতী অনন্ত প্রকাশের সঙ্গে অন্বয়ে সদাই বৃত করে দেয়। আবার এই ন্যাসের আরেকটি দিক হল সজ্জা। ন্যাস যোগে যুক্ত হয়ে সাধকের অঙ্গসমূহ নানাভাবে অন্তর রাজ্যকে সজ্জিত করে রাখে। এই সকল সজ্জা ভগবানের প্রীতি অর্থে।

ন্যাস যোগের অঙ্গাদি হয়ে রয়েছে বিপুল, বিস্তৃত। এই বিস্তৃত ন্যাসের মধ্য দিয়ে অঙ্গাদি সব নতুন করে যেন গড়ে উঠতে চায়। অন্তর ন্যাসের বিভাগগুলি হল ঃ

(১) চিত্ত ন্যাস; (২) প্রাণন্যাস; (৩) মূর্ত চেতন ন্যাস এবং (৪) জগন্ন্যাস।

(১) **চিত্ত ন্যাস** — চিত্ত ন্যাসটি হল প্রকৃতভাবে মনের ন্যাস। মনের পটভূমিতে রয়েছে নানা আকর্ষণের বিন্যাস। মন হয়ে রয়েছে নিমজ্জিত নানা বিষয়ে। সবই জগৎ বিষয়। এই জগৎ বিষয় মূলত রয়েছে জীবনের চাওয়া পাওয়া, জীবনের তৃপ্তি আর জাগতিক পরিতৃপ্তির সম্ভারে ভরপুর হয়ে রয়েছে মানবের মন প্রাণ হৃদয় হয়ে রয়েছে ভরপুর জড় আকাঙ্ক্ষা আর জড় অভীপ্সার একান্ত নিবেদনের জন্য। মনের মাঝে চাওয়া-পাওয়ার হিসাব হয়ে চলেছে অসংখ্য বিকাশ ভাবধারা এবং পর্বে। চিত্ত ন্যাসের তিনটি পর্ব ঃ (ক) বিস্মৃতি; (খ) বিবর্ণ ও (গ) বিমোচন।

(১ক) **চিত্তন্যাসে বিস্মৃতি ঃ** যা কিছু হয়ে রয়েছে মনের সঞ্চয় তার থেকে সরে আসবার প্রধান রাস্তা ও উপায় হল ভুলে যাওয়া। স্মৃতির কণাগুলি সরিয়ে ফেলতে হয়। স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে জীবনের সব ঘটনার সমষ্টি নিয়ে। কখনও ভাল কখনও মন্দ—জীবনের চলার পথের এই উত্থান-পতন; ভাল-মন্দের সব নির্যাস একের পর এক জীবনের পথচলায় হয়ে থাকে। স্মৃতির সম্ভারে এসবই যুক্ত হয়ে স্মৃতির ভাণ্ডার ভরে থাকে। এর থেকে সরে আসতে হলে স্মৃতির পটকে ধুয়ে-মুছে ফেলতে হয়। স্মৃতির ভাণ্ডার ক্রমে যদি ধূসর হয়ে যায়; ক্রমে তার প্রভাব জীবন থেকে সরে যায়, হয়ত বা একটি সময় আসে যখন চিত্তের পাত্র শূন্য হয়ে যাবে। যদি চিত্তের সম্ভার শূন্য হয়ে যায় তবে খুবই ভাল; অন্যথায় ন্যাসের সাধন পর্বের প্রথম ধাপ পূর্ণ করতে হলে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সাধনের এই পর্বে।

(১খ) **বিবর্ণের পথে চিত্ত ন্যাস** — স্মৃতির ভাণ্ডার কিছুটা কমে আসলেও একেবারে শূন্য হওয়া খুব সহজ পথ নয়। চিত্তন্যাসের পর্বে ক্রম অভিযানে বিস্মৃতির প্রয়াসে তখন ক্রমে স্মৃতির পট থেকে সব সঞ্চয় ক্রমে তরল ও বায়বীয় হয়ে ওঠে। বায়বীয় হয়ে যাওয়া স্মৃতির ভাণ্ডার ক্রমে উড়ে যেতে থাকে আবার কিছু অবশেষ থেকে যায়। অবশেষে বা রেসিডুয়াল মেমরি যেতে চায় না। এ জন্য সাধন প্রয়াসটি হয় ক্রমে এই অবশেষে থেকে যাওয়া স্মৃতির জমাট বেধে যাওয়া সারাংশ স্বতঃই স্থান অধিকার করে নেয়। সাধন প্রয়াসে এই অবশেষ অথবা সঞ্চিত স্মৃতির অংশ তার যে অবস্থানে দৃঢ় হয়ে থাকে তারই সব বর্ণ লোপ পেয়ে যদি যায় তবে স্মৃতির ভাণ্ডার শূন্য না হলেও তার প্রভাবটি ম্লান হয়ে যায়। সাধক এসময় স্বতঃই চেষ্টা করবেন যে, অবশেষ রেসিডুয়াল মেমরি যদি বিবর্ণ হয়ে যায় তবে তার মধ্যে থাকে না কোনও ক্ষমতা বা কার্যকারিতা। বিস্মৃতি আর বিবর্ণের পথ ধরে সাধক যতই এগিয়ে চলবেন ততই স্মৃতির ভাণ্ডার হয়ে চলবে ক্রমে শূন্য। অথচ শূন্যাবস্থায় পৌঁছানোর পর্বে যতটা প্রয়াস প্রয়োজন তার প্রায় সবটার পরও থেকে যায় স্মৃতির রেশ। এজন্যই বিমোচন পর্ব প্রয়োজন হয়। বিমোচন পর্বটি অতীব গুরুত্বের।

(১গ) **চিত্তন্যাসে বিমোচন** — বিমোচন পর্বে স্মৃতির ভাণ্ডারকে ধুয়ে ফেলতে হয়। চিত্তের সব কন্দরেই কিছু না কিছু সঞ্চয় থেকেই যায়। সমস্যা হল চিত্তভূমির প্রাচীন ভাণ্ডার যদি বা কমে যায় একেবারেই কিছু স্মৃতি থেকে যায়। চিত্তভূমি যখনই হয়ে যায় শূন্য তখনই আবার নতুন কিছু সংবেদ সেখানে প্রবেশ করে যায়। এজন্য চিত্তন্যাসের অন্তিম লক্ষ্য বিমোচন। এই পর্বে সাধক করবেন লীলাস্মরণ, লীলামনন বা ভগবৎ ভাবে নিমজ্জন। ফলে ক্রমে চিত্ত ভূমির শূন্য ক্ষেত্রেই ভরিয়ে দিতে হয়। ভগবৎ বাক্য, ভগবৎ ভাব, ভগবৎ লীলার পরিচয় জীবনের মাঝে আহ্বান করে নিয়ে আসতে হয়। চিত্ত ন্যাসের প্রয়াসটি পরিনামে চিত্তের সব স্মৃতির সঞ্চয়কে তাড়িয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ভগবৎ বাক্য ভাব ও লীলার সঙ্গমে ডুবে যেতে হয়। জীবনের এই প্রয়াস পথে সাধক এখন ব্রহ্মপথের অধিকারী হয়ে ক্রমে নিবিড় আলিঙ্গনে ভগবৎ ভবের গভীরে ডুবে যাবেন।

সাধকের দেববরৌ ঃ

ইন্দ্র প্রসূতা বরুণঃ প্রশিষ্ঠা।
যঃ সূর্যস্য জ্যোতিষৌ ভাগ মানশুঃ।
মরুদ্বেনে বৃজনে মন্ম ধীমহি সাধনে।
যজ্ঞং জনয়ন্ত সূরাঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/২)

যা কিছু হয়েছে জগতের জীবন মার্গে
যে প্রাণ হয়েছে দেবপ্রবাহের বার্তাবহী জীবন পথে।
হয়েছে তারই প্রাপ্তি সব দেব ঐশ্বর্য দেবরাজ ও দেব কৃপার পথে।
এখন এসেছে জীবনের মাঝে বহু ভাবধারার এই প্রকাশ পর্বে
তোমারই বিকাশ রীতি নিত্য বিবেকের অঙ্গীকারে বন্দী।
হয়েছে তারই উন্মোচন জগৎ মাঝে স্বতঃ জীব জোষে।
একই ভাবদৃষ্টি হয়েছে দৃঢ় তোমায় বরণের একান্ত আহ্বানে
সকল দেবরূপের এই আদি উৎসই দেবে প্রেরণা দেববরণের।

দেবতার নানারূপের জগৎ প্রকাশ ঃ

ইন্দ্রঃ বসুভিঃ পরি পাতু সৌগয়ম্।
আদিত্যৈ নৌ অদিতিঃ শর্ম যচ্ছতি মঃ।
রুদ্র রুদ্রেভিঃ দেবঃ অমৃতঃ মৃলয়াতি নঃ।
ত্বষ্টা নো গ্রাভিঃ সুবিতায় জিম্বনুঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/৩)

দেবতার সময়ে হবে স্নাত জীবন পর্বের সাধন চেতন।
দেবতার রাজধর্মের সীমানায় এসেছে জীবনের ভূমিকায়
এখন হয়েছে দেবভাব প্রজ্ঞার সমন্বয়ে হয়ে বৃত জীবন পথে
যা কিছুরই প্রমাণ রয়েছে সাধন মার্গে হয়েছে প্রতিষ্ঠা তারই।
ঐ রুদ্র দেবতার এই অনন্ত কালের পটে হয়েছে জীবনের মার্গে বৃত।
এখন হয়েছে বিকাশময় এই রুদ্র প্রকাশ তোমায় করে বরণ।
নানা ভাবে নানা দেব প্রকাশের এই মাধুর্য পর্বের বিকাশে।
জীবন পথের এই চেতন প্রবাহ হোক ভাস্বর তোমার কৃপার ছন্দে।।

সমন্বিত সত্যময় ঃ

অদিতিঃ দ্যাবাপৃথিবী ঋতং মহৎ।
ইন্দ্রঃ বিষ্ণুঃ মরুতঃ সচঃ বৃহৎ।
দেবাং আদিত্যাং অবশে হবামহে।
বসুন রুদ্রান্ তৎ সবিতারং সুদংস সম।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/৪)

সত্যের আকার রয়েছে ছড়িয়ে সর্বত্র সর্বভাবে।
পৃথিবীর বুকে মহাকাশের সকল উপাদানে হয়েছে বিস্তৃত।
যে ভাবপ্রভা ছিল সৃজন পর্বের সূচনায় জগৎ মাঝে
হয়েছে সে ভাবের নিত্য তৃপ্তি জগৎ পালনের এই পর্বে।
নানা সত্যের নানা রূপ রয়েছ নিহিত পরম সত্যের পরিপালনে।
বিষ্ণুর রূপবিগ্রহ ইন্দ্রের প্রভারাজি হয়েছে যুক্ত দেবতার ছন্দে।
সাধন প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা করে সংহত হয়েছে প্রাণময়।
দেবতার নানা রূপ প্রভার হয়েছে সময় হতে সমন্বিত সত্যময়।।

পূর্ণতার প্রকাশ অপেক্ষায় ঃ

সরস্বান্ ধীর্ভি বরুণৌ ধৃতরতঃ।
পুষা বিষ্ণুঃ মহিমা বায়ুঃ রক্ষিণী।
বৃক্ষ কৃতৌ অমৃতা বিশ্ববেদসঃ।
শর্ম নো যংসম ত্রিবরুথম্ অংহসঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/৫)

দেবরূপের প্রকাশ মহিমায় হয়েছে ভাস্বর জীবন সমূহ।
হয়েছে দেবরূপের এই প্রকাশ মাত্রায় বাস্তবে।
জীবনের এই পথচলায় অঙ্গীকারে হয়ছে স্বার্থক।
এই সাধন যজ্ঞের উপলব্ধির ধারায় করে আবাহন স্বতঃই।
এখন আসুক জীবনের এই সাধন পর্বে সত্যের উদার স্পন্দন
হোক তার উন্মোচন জীবন মাঝে করে বরণ দেবসত্য।
এখন শুধুই অপেক্ষা পূর্ণতার পরশে আসুক জীবনের অনুভব প্রাপ্তির।

ব্রহ্ম চেতনের জগৎ বিস্তার ঃ প্রাণান্যাস হতে হলে প্রাণের অন্তরে ডুবে যেতে হবে। প্রাণ শক্তির উপরই দাঁড়িয়ে থাকে জীবন। যা কিছু জীবনের অবলম্বন সবই ধারণ করে থাকে প্রাণে শক্তি। প্রাণশক্তির প্রয়োগই জীবনের পথ চলা। প্রাণশক্তি জীবনের সঙ্গে জগতের যোগসূত্র গড়ে দেয়। জীবন ও জগতের এই সংযোগই সব জীবনের জন্য হয়ে থাকে স্বতঃসিদ্ধ। বাইরের জগৎ থেকে আলো-বায়ু-জলের এই নিত্য সংযোগকে গ্রহণ করে এগিয়ে চলে জীবনের গতি। জীবন স্বতঃই হয়ে উঠবে নিত্য প্রকাশের স্বতঃ উন্মোচনী। যে ভাবসম্পদ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারই বিপুল প্রকাশ হয়ে চলেছে এই জগৎ মাঝে মহাজীবনের ভাবস্পর্শে । মহাজীবন ভগবান প্রতিষ্ঠা করেছেন সৃষ্টির সব বিস্তারকে নিয়ে, সব বৈচিত্র্য ও প্রকাশকে সংহত ও সমন্বিত, সমগ্র সৃষ্টি বিপুল ব্যাপ্তির একত্রে হয়ে চলেছে সদা প্রকাশে ভগবৎ ভাব ও প্রভাকে জগৎময় ছড়িয়ে দিতে আর একই সঙ্গে করতে এই প্রকাশের সঙ্গে অন্বয়।

অথ তত উর্দ্ধ উদৈত্য ল এব উদেতা ন অস্তমেতা।
একলঃ এব মদ্যে স্থাতা। তৎ এষঃ শ্লোকঃ। (ছা. উ. ৩/১১/১)

প্রতিটি জীবনই এই মহাপ্রাণের প্রাণ বিস্তার আর বিপুল বিস্তৃতির সঙ্গে যুক্ত। এই বিপুল বিস্তৃতি স্বতঃই বিকাশমান হয়ে জীবনের মাঝে করে চলেছে নিত্য বিকাশের অন্বয়। নিত্য বিকাশ হয়ে চলেছে প্রতিটি প্রাণের মাঝে যে ভাগবতী সূত্র রয়েছে তারই মাঝে। এই যোগসূত্র স্বতঃই জীবন ব্যাপ্ত হয়ে জীবনের সব সম্ভাবনাকে করে দেয় উন্মোচন। এমন বিকাশ ক্ষণে হয়ে থকে নিত্য বিকাশের সংযোগ সূত্র। যে মহাসূর্য স্বতঃই আলোক আর দীপ্তি দান করে চলেছেন তারই সময় আসে ঐ বিরাটের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের সংযোগের। ব্যক্তি জীবনের এই স্বতঃই উন্মোচনের ক্ষণ পর্বে হয়ে চলে যে সব ঢেউয়ের ওঠানামা তাদেরই হয়ে থাকে নিত্য বিকাশ সূত্র। এই নিত্য বিকাশ সূত্র জীবের জীবন মাঝে যা কিছু রয়েছে প্রশ্নমাত্রা তাকে অতিক্রম করে চলতে থাকে জীবনের সব পর্বে পর্বে। ভগবানের ব্যাপ্ত বিকাশ এমন করেই হয়ে ওঠে উপলব্ধিজাত।

ন বে তত্র নিম্লোচ ন উদিয়ায় কদাচন।
দেবাঃ তেন অহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণা ইতি।। (ছা. উ. ৩/১১/২)

যে মহাসূর্য হয়েছে জগতের জন্য প্রাণ সঞ্চারী। বায়ুর পঞ্চ প্রকরণের জন্য হয়ে চলে বিভিন্নতায় বিধৃত। যে পঞ্চ বিকাশ জীবনের অঙ্গে অঙ্গে হয়ে রয়েছে ব্যাপৃত তাদের প্রাথমিক বিন্যাস এই জীবন ব্রতে যুক্ত হয়ে থাকা। স্বতঃই হয়ে থাকা এই বিকাশের পর্বগুলি যেন জীবনব্যাপ্ত হয়ে জীবনের পথ চলায় দৃপ্ত সহযোগ দিয়ে চলেছেন। পরম সত্য তিনি হয়েছেন বিধৃত জীবনের প্রবাহে। জীবন ব্যাপ্ত তারই দৃপ্ত চেতন এমনই নিত্য বিকাশে স্বতঃ হয়ে ওঠে বিকাশশীল। এমন করেই হয়ে চলেছে জীবনের এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে জীবনের পরিতৃপ্তীর জন্য। এই জীবন মাঝে মহাজীবনের স্পর্শ চলে আসে ঐ মহাপ্রাণের প্রাণ সঞ্চার থেকে। মহাপ্রাণ থেকে যে প্রাণসঞ্চার হয়ে চলেছে স্বতঃই মহাপ্রাণের সঙ্গে নিত্য যোগ সূত্রেই তার সদা উন্মোচন। যেখানে দিব্য আলোক হয়েছে উন্মোচন সদাই সদাপ্রকাশের এই পর্ব মাঝে এসেছে যে জীবন মাঝে স্পর্শ হোক তার নিত্য স্ফূর্তি স্বতঃ বিকাশে। তিনি স্বয়ংই হন জীবনের মাঝে বিকশিত নিজ বিকাশ সূত্র করে অবলম্বন সদা বিস্তারে।

ন হ বা অস্মৈ উদেতি ন নিম্লোচিত সকৃৎ দিবা
হ এব অস্মৈ ভবতি। যঃ এতাম এবং ব্রহ্ম উপনিষদম্ বেদ।। (ছা. উ. ৩/১১/৩)

এই জগতময় বিস্তৃত সব আলোর দান দিয়ে তিনি স্বতঃই হয়ে চলেছে এই নিত্য সংবেদ আলোর প্রকাশ ও শক্তির সমন্বয়ে হয়ে চলবে জীবনের সদা বিকাশ ও উন্মোচনের সূত্র। এই উন্মোচন হয়ে চলবে জীবনের জন্য ধারক ও বাহক। জীবনকে ধারণ করে থাকা এই শক্তি ও আলোর সূত্র হয়ে চলেছে মুক্তির দ্বার উন্মোচনী। স্বতঃ ও নিত্য প্রকাশী এই জীবন ধারা যতই হয়ে উঠবে প্রাণের মাঝে মূর্ত

ততই হবে বিকাশ। প্রাণের এই বিকাশে জগৎময় ব্রহ্মশক্তির উন্মোচনও সেই সঙ্গে জীব শক্তির পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলার যুগপত অভিযান চলতে থাকবে জগৎ মাঝে।

তৎ হ এতৎ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ প্রজাপতিঃ মনবে
মনুঃ প্রজাভ্যাং তৎ এতৎ উদ্দালক অরুণয় জেষ্টায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম উবাচ।। (ছা. উ. ৩/১১/৪)

ভগবান স্বয়ং প্রকাশী হয়ে জগৎময় ব্যাপ্ত এই নিত্য সত্যকে জগতে করেছেন বিস্তৃত। জগৎময় তারই বিকাশের সূত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে সর্বত্র। যা কিছু জীবনের জন্য মুক্তির সঞ্চারী তারই হিয়ে ওঠে নিত্য বিকাশের দৃপ্ত উপস্থাপন। জগৎময় সব সৃষ্টির বিস্তার তাঁরই নিজস্বতার ব্যাপ্ত বিস্তার। এমন বিস্তার এই নিত্য দিনের জগৎ মাঝে এমন করেই ফুটে ওঠে তার নিজ ভাবসত্তার বিস্তার। এমন করেই হয়ে থাকে জীবনের মাঝে বিকাশ যদি হয়ে ওঠে বিকাশ ভাবনার সূত্র। বিকাশ ভাবনার এই প্রথা হয়ে থাকবে জীবনের মাঝে সম্ভাবনার সূত্র। এমন করেই হয়ে চলে জীবনের এগিয়ে চলা। এই এগিয়ে চলে থাকা জীবনের পথ দিয়ে সর্বত্রই দিব্য ভাববিকাশ হয়ে থাকে। এমন ভাব বিকাশের মৌল স্পর্শ রয়েছে জীবনের পথচলার নিত্য মহাযোগের বিকাশ সম্ভাবনার উত্তরণ স্বতঃই এই জীবনের স্বাভাবিক পথচলার মধ্য দিয়ে।

দেব আকর্ষণের কেন্দ্রে ঃ

বৃষ্ণা যজ্ঞৌ বৃষনঃ সন্তু যজ্ঞিয়াঃ।
বৃষণৌ দেবা বৃষনৌ হবিঃ কৃতঃ।
বৃষণা দ্যাবা পৃথিবীঃ ঋতাবরী।
বৃষাপজন্য বৃষনৌ বৃষস্তুতঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/৬)

এখনই এসেছে সময় জীবন মাঝে নিত্য ভগবতী প্রকাশের।
যেমন করে গড়ে উঠেছে বিপুল সাধন প্রয়াস স্বাতন্ত্রে।
এসেছে সময় করতে দ্বার উন্মোচনের দেবতার শক্তির জীবন প্রকাশে
এখন অবাধ অধিকারে হতে প্রাপ্ত দেবপ্রকাশ এই স্থানে।
যে মাধুর্যের রীতি হয়েছে সৃষ্টি হতে আনন্দিত জীবনে।
অনন্ত প্রকাশ এই মহা প্রবাহে রয়েছে দেবতার উন্মোচন।
যদি হয়েছ জীবনে উপস্থিত হও তবে স্থিত জীবন কেন্দ্রে
এখন এই জ্ঞান প্রবাহে হোক তোমার স্বতঃ উপস্থিতি।।

সাধন শক্তির ক্রমবিকাশে ঃ

অগ্নিসোমা নৃষমা বাজসাতয়ে।
পুরু প্রশাস্তা বৃষণা উপ ব্রুবৈ।
যঃ বাজিরে বৃষনো দেবযজ্ঞয়া
তা নঃ শর্ম ত্রি বরুণং বি যংসতঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/৭)

এখন হয়েছে সময় সাধন মার্গের সদা বিশুদ্ধির।
যে ভাব বিকাশ হয়েছে মূর্ত জীবনের নিত্য প্রকাশে
এখন দেবতার দান এসেছে জীবনের অন্ধকার খণ্ডনে।
নিত্য নিরঞ্জন হোক সঙ্গী সদা বিকাশের আলোক উৎসে।
ঐ সাধন শক্তির বিকাশের পদধ্বনি স্বতঃ নিবেদনে।
ক্রম বিকাশের এই ভাবপ্রয়াস করবে বিকশিত।
তোমারই শক্তির বিকাশ ক্ষণ এখন সাধনচেতন বিকাশে।
ঐ দিব্য প্রাণ সঞ্চারে আসুক তোমারই উদার দানে দেব উন্মেষে।।

দৈবীগুণের বিকাশ ঃ

ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞনিষ্কৃতো।
বৃহদিবা অধ্বরানাম্ অভিপ্রিয়ঃ।
অগ্নিহোতারঃ ঋতমাপৌ অদ্রুহী।
অপো অসৃজন্ অনু বৃত্রতুর্যৌ।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/৮)

দেবতার ঐ দেবছন্দের বিস্তৃতি এখন হোক সর্বত্র
দেবভাব দীপ্তি হোক ব্যাপ্ত বহুজনের মধ্যে জগৎ মাঝে।
দৈবীগুণের বিকাশ পথে হয়েছে উন্মোচনের আহ্বান।
যে ভাবপ্রভা সাধন পথের হয়েছে আহ্বান উন্মোচনের।
এখন হয়েছে সময় উপযুক্ত করতে যুক্ত সমাজ জীবনের মাঝে
যে ভাব দীপ্তি জীবনের জয়গানে হয়েছে সদাই মুখর
এই মহাবিশ্বের বিপুল সম্পদ আলো-বায়ু-জলের উদার দান
হয়েছে দিব্য সম্পদের জগৎ মাঝে সদা প্রয়োগ উৎস মূলে।

আবিশ্ব আবেষ্টনের নিত্য আবেশে ঃ

দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন অভিঃ ব্রতাঃ।
আপ ঔষধীঃ জনীয়ানিঃ যজ্ঞিয়া।
অন্তরিক্ষং স্বরা পপ উতয়ো
বশং দেবাসঃ তন্বী নি সমৃজঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/৯)

দেবতার এই সৃজন যজ্ঞে এসেছে বহু বৈচিত্রের প্রভা।
যে মহান সৃষ্টির উদার দানের রয়েছে অন্তহীন প্রজ্ঞা।
এখন এই সৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত দৃপ্ত প্রচার স্বরূপে।
এই মহা প্রকৃতির মাঝে দিয়েছে অনন্ত প্রদীপের আলোর স্রোত।
আকাশ-জল-ভূমি এই সমগ্র বিশ্বব্যাপ্ত চেতনার দৃপ্ত অভিযানে।
সাধন পথের অনন্ত প্রকাশ হোক জীবনের নিত্য ভিত্তি
অন্তরীক্ষের দৃপ্ত সংযোগ হয়েছে আকাশ মহিমায়
যে ক্ষণ প্রভা ছিল জীবনের সঙ্গে দৃপ্ত তন্ময়তার ভাবপ্রবাহে।

ভক্ত হৃদয়ে তিনি মূর্ত ঃ আবাহনি মন্ত্রে ঋষিগণ জীবনের কর্ম-পথচলার মাঝেই ভগবানকে স্বতঃ আহ্বান করতেন। আবাহনি মন্ত্রের ছন্দ নিনাদ গড়ে দেয় ওম্ এর ধ্বনি। ওম্ ধ্বনিটি নাভি পদ্মের সঙ্গে যুক্ত তাই নয়, এটি মণিপুর চক্রে ধ্বনিত হয়ে যদি উর্দ্ধ চক্রদির অভিমুখে এগিয়ে আসে তবে, ধ্বনি মাত্রাটি একদিকে যেমন ব্রহ্মভাবের অনুসারী অধ্যাত্ম স্পন্দন যেমন সূচিত হতে থাকে, তেমনিই এরই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে জীবন স্পন্দন। পৃথিবীর কান্না-হাঁসি সবই মিশে থাকে যেমনে একদিকে তেমনি অন্যদিকে মহান উত্তরণের আহ্বান ধ্বনিত হয় ওম্ এর নিত্য স্পন্দনে।

গায়ত্রী বৈ ইদম সর্বম্ ভূতম্ যৎ ইদম্ কিম চ।
বাক বৈ গায়ত্রী বাক্ বা ইদম্ সর্বম্ ভূতং গায়র্তি চ ত্রায়তে চ।। (ছা উ. ৩/১২/১)

ভগবানকে যিনি বরণ করতে চান তার পক্ষে যে সাধন প্রয়াস হতে হবে তার রয়েছে কত বিভিন্ন ভাব। একেক জনের একক ভাব ও বিন্যাসের পথ। প্রতিটি ভাব ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে পারে সাধন প্রয়াস। ভগবৎ পথের প্রয়াসীর পক্ষে প্রয়োজন একাগ্রতার পথে এগিয়ে চলার। মনকে একাগ্র করতে হলে চাই মনের বিশুদ্ধতা। মন জড়িয়ে থাকে নানা ধরনের আবিলতায়। প্রতিটি আবিলতাই মনের মধ্যে মালিন্য হয়ে বিরাজ করছে। মনের মাঝে হয়ে রয়েছে এমন ক্লিষ্ট হতে হওয়ার আবিলতার মাঝে মনের গড়ে ওঠে নানা ধরনের বন্ধন। এই বন্ধন মনের মাঝে একটি স্বাতন্ত্রের দীপ্তি গড়ে তুলবে। মনের ক্লিষ্ট হওয়ার নানা দিক রয়েছে। অবিদ্যা-অস্মিতা রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ এগুলির সবই মনের ক্লিষ্টতার এক একটি দিক। অবিদ্যা হল ভগবৎ প্রজ্ঞার বিপরীত। যা কিছু হয়ে রয়েছে জীবনের উত্তরণের প্রতীক সেগুলির সবই ভাগবতী বিদ্যার প্রতীক হয়ে ওঠে। ভগবানকে বরণ করে নেওয়ার জন্য যে ভাব ও ভাবনার সূচনা হয় সেসবই অবিদ্যা বিনাশি ভগবৎ ভাব ও ভাবনার চর্চা যতই হতে থাকবে মনের ক্লিষ্টতা ক্রমে কমতে থাকবে।

যা বৈ সা গায়ত্রী ইয়ম বাব সা যঃস ইয়ং পৃথিবী।
অস্যাম হি ইদম সর্বম্ ভূতম্ প্রতিষ্ঠিতম। এতাম এবম অতিশীয়তে।। (ছা. উ. ৩/১২/২)

ভগবানকে নানা রূপে নানা নামে ডাকা যায়। যে কোনও নাম ও রূপই তাঁর নিত্য স্বরূপের মৌল প্রকাশ ঘটাতে পারে। শুধুমাত্র রূপে নয়, অরূপের আহ্বানও সাধন পথের একটি প্রধান পথ। সাধন পথের প্রধান অবলম্বন প্রয়াস, প্রস্তুতি ও নিবেদন। স্মরণ-মনন-চিন্তন সাধন পথের সোপান। স্মরণের পর্বটি অতি নিবিড়। ভগবানের কোনও রূপ অথবা ভগবানের জগৎ পরিচয়ের মধ্যে যত লীলার

বিষয়ে সাধক জ্ঞাত রয়েছেন তাদের মধ্যে একটির স্মরণ। লীলাস্মরণের পদ্ধতিটি স্থবির অথবা গতিময় হতে পারে। স্থবির বিষয়ে লীলার একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে যেন ভগবানের জগৎ পরিচয়ের বিপুল কর্মমার্গ থেকে যে কোনও একটি মুহূর্তকে নির্দিষ্টভাবে স্মরণের পটে নিয়ে আসা হয়। স্মরণে এই নির্দিষ্ট অবস্থাটি যেন ক্যামেরার একটি ছবি দৃঢ়-স্থিত হয়ে এই ছবি বিকশিত হয় জীবনের মধ্য দিয়ে। গতিময় পরিচয় হল — ভগবৎ লীলার এই মাধুর্যকে ছড়িয়ে দিয়ে সময়ের পরম্পরার উপলব্ধির আওতায় নিয়ে আসা। ভগবৎ লীলার গতিময় অবস্থাটি লীলাপর্বে সময়ের সাপেক্ষে এগিয়ে চলা। লীলার মাধুর্য আরও ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে যদি সাধকের অনুভব নেত্রে ঐ লীলার সঙ্গে সাধক যুক্ত হন কোনওভাবে।

যা বৈ সা পৃথিবী ইয়ম বাব সা যৎ ইদম্ অস্মিন্ পুরুষে শরীরম।
অস্মিন হি ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠাতাঃ এতৎ এব ন অতিশয়ন্তে।। (ছা. উ. ৩/১২/৩)

যখন লীলা স্মরণ হতে থাকে সাধকের প্রাণ-মন-হৃদয়ের পটভূমিতে হয়ে থাকে ঐ লীলার সঙ্গে সংযোগ। লীলা সংযোগটি স্থিত বা গতিময় উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। লীলার এই প্রবাহ হয়ে ওঠে স্বতঃই একান্ত আপনার। লীলা স্মরণের ফলে সাধক এই লীলা পর্বের একজন হয়ে উঠতে পারে। একটির পর একটি পর্বের মধ্যে হয়ে চলেছে একান্ত নির্দিষ্ট ভাব প্রবাহের মধ্যে ছড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। এখন সম্পর্ক প্রস্তুত হয়ে যায় ভগবান ও ভক্তের মাঝে। ভগবান ও ভক্তের মাঝের সেতুবন্ধন হয়ে যায় ভাবে-স্পন্দনে আর উপলব্ধির সোপানে। উপলব্ধির এগিয়ে চলার পর্বে সব অঙ্গের মাঝে এক অনন্য সংযোগে হয়ে গিয়ে দেহ-মন-প্রাণ-হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই উপলব্ধির তড়িৎ সংবেদ পৌঁছে যায়। ভগবান ও ভক্ত নিবিড় সংযোগের এই ক্ষণে ভক্ত হৃদয়ের মূর্ত মুহূর্তগুলি একটির আহুত স্পন্দন সঞ্চারিত হয়ে যায়। সাধকের জীবনে এই স্পন্দন জীবনের গতিমুখকে ঘুরিয়ে দিয়ে অন্য ভাব প্রবাহের মধ্যে যে আবিলতা ক্লিষ্টতা রয়েছে তার সীমার গণ্ডী পেরিয়ে যেতে চায়। লীলাস্মরণে আর একটি বিশেষ উল্লেখের দিক হল লীলাময় মাধুর্যকে আবাহন করে জীবনের পটভূমি বিস্তৃত হতে থাকে। ভগবৎ ভাবনাটি এমন ক্ষেত্রে ক্রমে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়ে যায়। উপলব্ধির এই পর্বের মাঝেই সাধক নিজ আয়নায় এমন ক্ষণে অনুভব পেয়ে যাবেন ঐ লীলাপ্রবাহের হয়ে সাথী। সময়ের প্রবাহের সঙ্গে হয়ে চলে এখন চেতনার জাগরণ ও উন্মোচনের পর্ব। চেতনার এই জাগরণ ও উন্মাচন আবারও চেতনাকে গভীর দ্যোতনায় নিয়ে যায়।

আত্যন্তিক বরণে ভগবত্তার দীপ্তি ঃ

ধর্তারো দিব ঋভবঃ সুহস্তাঃ।
বাত অপর্জন্যা মহিষস্য তন্যতৌঃ।
আপ ঔষধী, প্রতিরন্ত নৌ শিরঃ।
ভগো রাতি বাহিনী যন্তু মে হবম্।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/১০)

এই অনন্ত সৃষ্টির অনির্দেশ্য দিগন্ত বিস্তৃত আবহে
পেয়েছি কৃপার প্রসাদ ব্রহ্ম সনাতনের দিব্য প্রজ্ঞার উন্মোচনে।
এখন হয়েছে যে বাক সত্তার উন্মোচন জগৎ মাঝে স্বতঃই
পেয়েছি তার নিত্য দিনের একান্ত প্রেরণার স্পন্দন জীবন মাঝে।
দেবরাজের এই নিরুপম প্রকাশের মাঝে এসেছে দেবস্পন্দন
ঐ দেবস্থানের বিপুল প্রশান্তির অনন্ত ভাব দীপ্তির নিত্য আবহে।
এখন এসেছে সময়ের দাবী করতে বরণ দেবদীপ্তির জগৎ বিনিয়োগে
সেই ভাবপ্রবাহ হয়েছে জীবনের আত্যন্তিক বরণের সদা আকর্ষণী।

প্রাণের গভীরে নিয়ে অনন্ত বার্তা ঃ

সমুদ্রঃ সিন্ধুঃ রজঃ অন্তরিক্ষম্।
অজঃ একপাত তনয়িত্ তু অর্নবঃ।
অহিঃ বুধ্নঃ শৃনবৎ বচংসি।
মে বিশ্বে দেবাস উত সুরয়ৌ মম।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/১১)

ঐ দিব্য বার্তা হয়েছে স্পন্দিত জীবনের এই জাগরণ ক্ষণে।
যেমন করে হয়েছে দিব্য প্রেরণার সঞ্চার সাধন জীবন পর্বে।
এসেছে তারই নিত্য বিকাশের সদা স্পন্দনের স্রোত এখন এখানে।
যেমন করে হয়েছে নিরুপণ একান্ত প্রকাশের এই ক্ষণে।
দেবতার দেওয়া কৃপার পরশ এসেছে জীবন পথের উন্মাচনে

এখন প্রকৃতির এই নিত্য বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মাঝে এসেছে বার্তা।
যে প্রাণে হয়েছে প্রস্তুত বার্তা তোমারই বিকাশ পর্বে স্বতঃই।
এসেছে প্রেরণার পরশ সে প্রাণের গভীর হতে সদা বিকশিত।।

দিব্য সূর্যের ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভার ঃ
স্যাম বো মানবঃ দৈববীতয়োঃ
প্রাচ্যং নো যজ্ঞং প্র নয়ত সাধুয়া।
আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুদানব।
ইমা ব্রহ্ম শস্বমানাসি জিম্বতঃ।। (ঋ. বে. ১১/৬৬/১২)

ঐ দেবার্চনার সাধকগণ এসেছেন এখন একান্তে
ব্যাপ্ত এই জীবন পথে হয়েছে উন্মুক্ত দৃপ্ত সঞ্চালনে
যেমন করে এসেছে জীবনের মাঝে তোমায় করে বরণ।
অমৃতের আহ্বানে এসেছে এখন দেবতার চেতন উন্মোচনে।
হে জ্যোতির্ময় তোমার ঐ সনাতনী রূপ মাধুর্যে হয়েছি ভরপুর।
ভাগবতী ভাবপ্রভা হোক জাগ্রত জীবনের প্রত্যয় মাঝে
এই ভাবময় নিত্য প্রভা হোক রূপময় রূপসঞ্চারী।
বিশ্বমাতার ভাবসংবেদ হোক জীবনের সদা উন্মোচনী।।

উন্মুক্ত দৈবীপথ ঃ
দেব্যা হোতারা প্রথমা পুরোহিত।
ঋতস্য পন্থানম অন্বেষু সাধুয়া।
পতিং প্রতিবেশম ক্ষেত্রস্য ইমহে।
বিশ্চান্ দেবান্ অমৃতাং অপ্রুয়া।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/১৩)

মনের রাজা হয়ে সাধকের প্রয়াস হয়েছে তীব্র এখন।
ঐ ব্রহ্ম সনাতনের আহ্বান বাণী শুনেছে সাধক মন।
বিশ্বমাঝে মহাসূর্যের বার্তা এসেছে জীবন কন্দরে।
অর্চনায় বন্দনায় করি আবাহন তোমার মাতৃশক্তি।
যেমন করেই এসেছে জীবনের কাছে নিত্য আবাহন।
দাও তোমার সত্যের উপহার জীবনের পটভূমিতে কর্মপথে।
ঐ অনন্ত সত্যের ভাণ্ডার হয়েছে উন্মুক্ত তোমায় আবাহনে।
হে প্রভু তোমারই ভাবদীপ্তি আসুক জীবন মাঝে উন্মোচনে।।

হৃদয়ের আহুতি দিয়ে ঃ লীলাস্মরণের এই পর্ব ক্রমে লীলার রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে নিজ চেতনকে স্থিত করে দেয় রূপ বিহীন শাশ্বত-সনাতনী রূপের স্তোতনায় মহাশূন্যের মহাব্যাপ্তির যাত্রা যেন সূচনা হয়ে যায়। ভক্তির পথ ধরে এগিয়ে চলে যে ভাগবতী সাধন সেখানে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটি প্রধান হয়ে ওঠে। ভগবান কখনও ভক্তের পিতা-মাতা রূপে; আবার কখনও বা বন্ধু সখা রূপে ফুটে ওঠেন। কখনও বা ভগবান-ভক্তের সম্পর্ক এতটাই নিবিড় হয়ে ওঠে যে জাগতিক দৃষ্টি ও বিবেচনায় সেটি স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে। বৃন্দাবন পর্বে ভগবান ভক্তের লীলার তাৎপর্য জাগতিক দৃষ্টিতে শোভনাতীত। অথচ ভক্তির এটি শিরোমনি অবস্থা।

যৎ বৈ তৎ পুরুষে শরীরম্ ইদম্ বাব তৎ যৎ ইদম্ অস্মিন্
অন্তপুরুষে হৃদয়ম্ অস্মিন্ হি ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ এতৎ এব ন অতিশীয়ন্তে।। (ছা. উ. ৩/১২/৪)

ভক্তির শিরোমণি অবস্থায় ভগবান স্বয়ং হয়ে ওঠেন এমন বিচিত্র যে যুগপৎ তাঁর উপস্থিতির পরশ প্রকৃত প্রয়াসী পেয়ে যান। একই সময়ে, একই সঙ্গে স্থিত ও গতিময় হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যান সর্বত্র। সৃষ্টির সব প্রান্তেই তিনি বিরাজ করেন। তিনি বিরাজ করেন - স্থলে। তিনি স্বয়ং হয়েছেন সদা ভাস্বর সব আকাঙ্ক্ষীর সাধন চেতন। অন্তর মাঝে যে চেতনার দীপ্তি রয়েছে তারই হয় প্রসারণ। ভগবান স্বয়ংই সেই পরম পুরুষ যিনি অবয়বে বিরাজ করেন। আবার নিরাবয়ব হয়ে সেই তিনিই স্বতঃ বিরাজিত সর্বত্র। তিনি জীবের

মনে-প্রাণে-হৃদয়ে বিরাজমান। মহাশূন্যে ব্যাপ্ত হয়ে তিনিই সকল ক্ষেত্রের মধ্যেই রয়েছেন। মহাশূন্যে তিনি বিরাজমান। তিনি মহাব্যোমে ব্যাপ্ত হয়ে সৃষ্টির সর্বত্র দিয়েছেন প্রাণের পরশ।

সঃ এষা চতুষ্পদা ষড়বিধা গায়ত্রী তৎ এতৎ ঋচম্ অভ্যনুক্তম্।। (ছা. উ. ৩/১২/৫)

মহাব্যোমে ব্যাপ্ত হয়ে অবয়বের সীমা অতিক্রম করেন। জাগতিক সীমাগুলির মধ্যে যে প্রাণসম্পদ তার উপস্থিতি হতে পারে সর্বত্র। প্রকৃতির মাঝে তিনি সৃজন করেছেন প্রাণের বেড়ে ওঠার সম্পদ। এই সম্পদই ক্রমে সীমার প্রাচীর টপ্‌কে চলে যায়। তখন চেতনার বিস্তার ঘটে। ওম্ এর ধ্বনির নিনাদ বিশ্বময় হয়ে যায় ব্যাপ্ত। ভাবনার গভীরতায়, চিন্তনে, জপের ঐকান্তিক মনের একাগ্রতায় ভগবান স্বয়ং তাঁর মহাব্যোমের অরূপ সুন্দর জীবনের গভীর অন্তপুরে স্থান নিয়ে নেন। এমন ক্ষণটি ভগবান ভক্তের জন্য একীভূত চেতনের মাঝে ডুবে যাওয়া। এই ডুবে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে জীবনের সব প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষার নিষিক্ত হয়ে যাওয়া ঐ চেতন মাঝে।

তাবান্ অস্য মহিমা ততঃ জায়াং চ পুরুষঃ।
পাদঃ অস্য সর্বা স্তোনি ত্রিপাৎ অস্য অমৃতম্ দিবি ইতি।। (ছা. উ. ৩/১২/৬)

ব্রহ্মচেতন জাগ্রত হয় সে প্রাণে-মনে-হৃদয়ের মাঝে যেখানে হয়েছে এমনতর বিপুল আকৃতি ভগবানের জন্য। মনের মাঝে ওম্ এর স্পন্দন জাগ্রত হলে সব স্তরে স্তরে যে মনোচেতনা যাকে এক অনবদ্য ভগবত্তার মধ্যে হয়ে থাকে নিমজ্জন। এমন হলে ক্ষণমাঝে যে ক্ষণদীপ্তি তারও হয়ে উঠুক ঐ অনন্যতার মূর্ত প্রকাশে। ভগবানের প্রকাশ যে অন্তর মাঝে হতে থাকে তার স্বতঃই বিকশিত হবার পটভূমি গড়ে ওঠে জীবনের পর্বে পর্বে। জীবন মাঝে যেসব আহ্বান রয়েছে এই জগৎ প্রপঞ্চের জন্য তাদের সবই হয়ে উঠেছে জীবনের প্রধান অবলম্বন। যে জীবন প্রবাহ স্বতঃই হয়ে ওঠে একান্ত নিবেশের তাদের সবই হয়ে ওঠে নিত্য প্রয়াসী অভিব্যক্তি ও দ্যোতনা। যেমন হয়ে চলেছে নিজ চেতন মাঝে এই জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনের তার সীমা করে অতিক্রম নিত্য-নিরঞ্জনের সচল জীবন অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে জাগতিক চেতনে আবিষ্ট প্রাণের মধ্যেও।

যৎ বৈ তৎ ব্রহ্ম ইতি ইদম্ বাব তৎ যঃ অয়ম্ বহিধাঃ
পুরুষাৎ আকাশঃ যঃ বৈ সঃ বহির্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ।। (ছা. উ. ৩/১২/৭)

যখনই হৃদয়ের আকৃতি হয়ে যায় তৈরী স্বতঃই। জীবনের পর্বে পর্বে স্বতঃই হয়ে ওঠে নিত্য বিকাশী সদা প্রত্যয়ের নিজ বিকাশ আকাঙ্ক্ষার হয়ে বিধৃত। এই বিকাশপর্ব সদাই জীবনের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার দৃপ্ত আবেশ নিজ অন্তরের আকুতিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে সক্ষম। এই নিত্য বিকাশের পর্বে পর্বে জড় আকর্ষণী স্বতঃই যেন আবেষ্টন করে থাকে। ভগবৎ অভীপ্সায় একমাত্র এই আবেষ্টনকে বিগলিত করে ছিন্ন করে দিতে পারে। ভগবানের প্রতি চাওয়া যখন মূর্ত হয়ে যায় মন-প্রাণ-হৃদয়ের মাঝে ভাগবতী আকর্ষণ তীব্র হতে থাকে, তখন জগৎ চেতন ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। জগৎ চেতনের এই ক্রম সংকোচন যেমন একদিকে শুরু হয়ে যায় তেমনি আবার ঐ জগৎ চেতনের যেমনই হয় সঙ্কোচন তেমনই ভাগবতী চেতনের দীপ্তি হয় প্রসারিত। ক্রম বিস্তারে এখন ভাগবতী চেতনই জীবনের গভীর গহন অভ্যন্তরকে সার্বিকভাবে স্পর্শে বিকশিত হতে দেয়। স্পর্শপ্রভাব এমনই তীব্র হতে পারে যে জড় চেতনের প্রতিটি কণায় কণায় ভাগবতী চেতন প্রবেশ করে যায় আর নিজ স্পন্দনের গতিময়তায় সমগ্র জড় চেতনকণকে জারিত করে দেয় ভগবৎ ভাবে, সাধক এখন সমধিস্থ।

ভাগবতী ইচ্ছায় হয়ে ব্যাপৃত ঃ বশিষ্টাম্ পিতৃবদ্ধা আর্চম অক্রতঃ।
দেবাং ইলাদা ঋষিৎ স্বস্তয়ে।
প্রীতা ইব জ্ঞানয়ঃ কামম্ ইত্যায়।
কামম্ ইত্যেহ অস্মে দেবাসঃ ইব ধুবুয়।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/১৪)

পিতার ঔদার্যে হয়েছে জীবনের ক্ষেত্রে অভিনিবেশ।
যেমন করে পরম্পরায় হয়েছে ঋষি বশিষ্ঠের বেদবিস্তার।
এই জগতের মাঝে দিব্য ভাবসঞ্চার তেমনেই হয়েছে ভাস্বর।
ঐ অনন্তের ভাবপথ হয়েছে সদা উন্মোচন জগতের পটে।
এখন এমনই বিস্তার এসেছে জীবনের মাঝে ঋষিত্বের সত্য প্রভায়।
মনের দিগন্ত হয়েছে মুক্ত করতে বরণ এই দিব্য সত্ত্বায়।
যেমন করেই তোমারই চাওয়ার দীপ্তি হয়েছে প্রসারিত জীবনে।
দেবছন্দে দেবসঙ্গে হয়েছে আত্মার সংযোগ জগতের জাগরণে।।

বিশ্বাত্ম সাধনেঃ

দেবান্ বশিষ্ঠঃ অমৃতান ববন্দে।
যে বিশ্বা ভুবনাতি প্রত্যস্থুঃ।
তে নো রাসন তাম উঞ্চগায়ম্ অদ্য।
যুয়ং পাত স্বস্তিতিঃ সদান।। (ঋ. বে. ১০/৬৬/১৫)

ঋষির প্রত্যয়ে পুর্ণতার অভিমুখে চলেছি এগিয়ে
ব্রহ্ম পথের এই অভিমুখ হোক পূর্ণতার ভিত্তি পটভূমি।
যে ভাবদীপ্তি ঐ উর্দ্ধ মার্গে হয়েছে বিশ্ব বিকাশ।
জীবনের চলার পথের সত্য সমূহ করে সমন্বিত হোক সাধন।
এখন এমন বিজয় প্রভা আসুক জীবনের নিরীখে কর্মপ্রবাহে।
ভগবৎ কৃপার অমৃত বারি এসেছে সাধন উপলব্ধির স্রোতে।
দেবতার দান এসেছে জীবন মাঝে ভাগবতী পথ করে অতিক্রম।
দেব ভাবদীপ্তির হোক এখন উন্মোচন এই বিশ্বাত্ম সাধনে।।

ঋতপথে বিশ্বমাঝে ঃ

ইমাং বিয়ং সপ্ত শীর্ষ্ণীং পিতারং।
ঋত প্রজাতাং বৃহতী সঃ অবিন্দ।
তুরীয়ং স্বিজনয় স্বতঃ।
বিশ্বজন্যৈ অয়াস্য উক্থম ইধ্রায় শংসন্।। (ঋ. বে. ১০/৬৭/১)

যে সাধন প্রয়াস দিয়েছে অন্তিম বার্তা জীবন মাঝে।
হয়েছে যতই প্রসারিত এই সাধন আস্পৃহা স্পন্দনে।
এখন তারই প্রকাশ দীপ্তি জগৎ মাঝে হয়েছে ব্যাপ্ত সর্বত্র।
যে ভাবসম্পদ হয়েছে ব্যাক্ত দেবতার এই দৃপ্ত প্রকাশ পর্বে।
এসেছে তারই মূর্ত ভাব সংবেদ সদা অন্বয়ে শূন্যপথে।
যে সত্যের হয়েছে জগৎ প্রকাশ সৃষ্টির মাঝে স্বতঃই।
এসেছে ঐ সত্যের প্রাণদীপ্তি তোমায় বরণে একান্তে সাধকের সনে।।
এখন তুরীয় ভাববিকাশ সাধন জীবনে এই জাগরণ পর্বে।।

সত্যের প্রদীপ ঃ

ঋতং শংসন্ত ঋজ্জী দীর্ঘ্যানা।
দিবস্পুত্রঃ অসৌ অসুরস্য বীরা।
বিপ্রম পদম্ আঙ্গরসো দধানা।
যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং এম অনন্তং।। (ঋ. বে. ১০/৬৭/২)

সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়েছে যে প্রাণ অন্তর মাঝে
হয়েছে যে প্রাণেঁর নিত্য প্রকাশ একান্তে অনুভবে।
জ্ঞানের আলোক হয়েছে প্রদীপ জীবনের এই ক্ষণপ্রভায়।
এখনই হয়েছে এই ভাবপথের দৃপ্ত জাগরণ জগৎ পথে।
ঋষির সত্যের আলোক হয়ছে সদা প্রত্যয়ে সদা প্রকাশিত
যেমন করে হয়েছে অঙ্গিরার প্রত্যয় জীবন যজ্ঞের আহুতি।
এই নিত্য পথের দিব্য অঙ্গিকার হোক সত্য চয়নে সদা ব্রতী।
সত্যের জাগরণ হয়েছে ঋষি জীবনের এই ভাবপ্রত্যয় পথে।।

চাই সত্যময় জীবন প্রবাহ ঃ অন্তরে ব্রহ্মচেতনের ক্রম সঞ্চার সাধকের জীবনমাঝে গড়ে দেয় নবীন অনুভূতি। যা কিছু এতদিনের বাস্তব বলে বোধ আর বাস্তবের জ্ঞানবার্তা এসেছে যেখান হতে সেসবই ম্লান হয়ে যায়। ক্রমে বিকাশের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচেতনের দীপ্ত প্রকাশ ঘটে যাবে জীবনের মাঝে। যখনই হয়েছে যথাযথ ভগবৎ আকাঙ্ক্ষা জীবন মাঝে। তখনই হৃদয়ের এ অন্তঃপুরের আকাশে ফুটে

উঠবে দিব্য সূর্য। এই দিব্য সূর্য জীবনকে ক্রম পর্যায়ে করে নেবে বরণ যদি ভগবানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই বিকশিত হয়ে ওঠে। অন্তরের আকাশে জ্যোতির্ময় স্বয়ংই দিব্য সূর্যের আলোক বলয় থেকে ক্রমপর্যায়ে হবেন স্বপ্রকাশ।

অয়ং বাব সঃ যঃ অয়ম্ অন্তঃপুরুষঃ
আকাশঃ যঃ বৈ সঃ অন্তঃ পুরুষঃ আকশঃ।। (ছা. উ. ৩/১২/৮)

সাধকের এখন আকাশ চেতনের পরিচিতির সূচনা অন্তর মাঝে জ্যোতির্ময় ঐ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাধক নিত্য দিনের এই মহাপ্রকাশকে নিজ অস্তিত্বের মধ্যে বিকশিত হতে দেখবেন। নিত্য বিকাশে ঐ অন্তরের দেবসূর্য হয়ে উঠবেন মহাপ্রকাশী। এখন সময় হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে ভগবানের জন্য স্বতঃই মূর্ত হয়ে উঠবে। যতই হতে থাকবে জীবনের উত্তরণের এই ক্ষণের নিত্য বিকাশ অন্তরের দেবসূর্য বুঝিয়ে দেবেন যে ঐ অন্তরের আকাশে হয়ে উঠেছে স্বতঃই এই জীবনের অন্তর্জগতে হয়ে উঠবে এক অন্য ভাব প্রকাশী নিত্য অনুভব। সাধকের জীবনের অভ্যন্তরে হয়ে উঠবে নিত্য সূর্যের মহান ঐ অনন্ত পুরুষ হয়ে উঠবে জীবনের ব্যাপক রূপ বিস্তার। যে রূপ বিস্তার হয়ে থাকে জীবনের মাঝে একান্ত আপনার হয়ে ওঠে ঐ অনুভবের। ঐ অনুভবের ক্রম বিস্তার হয়ে উঠুক জীবনমাঝে একান্ত আপনার হয়ে ওঠে ঐ অনুভবের। ঐ অনুভবের ক্রমবিস্তার হয়ে উঠুক জীবনমাঝে পরম পুরুষের জ্যোতির্ময় প্রভা ও দীপ্তি। এই জ্যোতির্ময় আলোক রূপ হয়ে উঠুক জীবনের জন্য এক নবীন প্রকাশী। এখন এই ভাবপ্রভায় উদ্ভাশিত হয়ে উঠবে নবীন উপলব্ধির ভাবপ্রকাশ।

অয়ং বাব সঃ যঃ অয়ম্ অন্তঃ হৃদয়ে আকাশঃ তৎ এতৎ পূর্ণমঃ প্রবর্তি।
পূর্ণম্ অপ্রবতিনীং শ্রিয়ং নভতে যঃ এবং বেদ।। (ছা. উ. ৩/১২/৯)

উপলব্ধির সূচনা আসে আজ্ঞাচক্রে। ত্রিনয়নের স্থানের উপলব্ধিটি আলোর বলয়ে অথবা শিখাময় জ্যোতির উপস্থিতি। দিব্য চৈতন্যের বিকাশে উপলব্ধির প্রবাহ চলে আসে হৃদয়ের মাঝে। এখনই এই হৃদয়ের মাঝে ফুটে উঠবে আহ্বান জীবনের জন্য নিত্য স্পন্দনের এই একান্ত অনুভবের প্রয়াস। যে প্রয়াস জীবনের এগিয়ে যাওয়ার জন্য হতে পারে একান্ত নিবেদিত তারই ভরে উঠবার জন্য হয়ে উঠবে নিত্য বিকাশের পটভূমিটি। জ্যোতির্ময়, তিনি আলোয় হয়ে রয়েছেন জ্যোতির্ময়। যে জ্যোতির বিকাশে তিনি হয়েছেন জীবনের জন্য ক্রমপরিণতির বাহন। এমন করেই হয়ে উঠবে ভাগবতী অনুভবের বিকাশ জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ তিনিই হয়ে উঠবেন সাধক জীবনের জন্য রূপান্তরের প্রবাহী রূপান্তরের এই পর্বের প্রয়াস হয়ে চলবে জীবন ভোর একান্তভাবে অনুভব বিকাশের নিত্য আবহে একাত্ম হয়ে যাওয়ার বিশেষ ক্ষণ ও একান্ত আকর্ষণী দিব্য ভাবের বীজ সবারই অন্তর মাঝে রয়েছে। একে জাগিয়ে তুলতে হয় বিশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসা দিয়ে।

সমানঃ উ এবায়ং চ অসৌ চ উষ্ণঃ অয়ম্ উষ্ণ অসৌ স্বর ইতি ইমঃ আচক্ষতে।
স্বরঃ ইতি প্রত্যস্বরঃ ইতি অমুম। তস্মাৎ বা এতম ইমম অমুমচ উদ্গীতম্। উপাসীত। (ছা. উ. ১/৩/২)

ভগবান শাশ্বত সনাতন। তিনিই আবার পরমাত্মা হয়ে, সৃষ্টির সর্বত্র, বৃহতে, সূক্ষ্মে বিরাজ করছেন। তিনি পরমাত্মার বিশেষ নিরাবয়ব অবয়বে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁরই একটি দিক হল মহাপ্রাণ হয়ে বায়ুর কণায় কণায় ছড়িয়ে থাকা। তিনি সূক্ষ্মের চেয়েও অতি সূক্ষ্ম; আবার অন্যদিকে স্থূলের চেয়েও অতি স্থূল। তিনি বিরাজ করছেন নিজ অরূপের স্বরূপে। আবার তিনিই হয়ে রূপবান, সামান্য অবয়ব পরিচয়ে জগতকে সার্বিকভাবে আবেষ্টন করে রয়েছেন। পরমাত্মাই তার নিজস্ব প্রেরণায় পরিচালিত হয়ে দিয়েছেন গড়ে জগতের মাঝে। বিশ্বময় ব্রহ্ম সম্পন্দন হয়ে চলেছে সদা নন্দিত। পরমাত্মাই এখন হয়েছেন জীবাত্মা রূপে। তার নিজস্বতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রপ্রকাশ ঘটিয়েছেন একএকটি জীবনের মধ্য বিকশিত প্রতিটি জীবনকে স্বাতন্ত্রের মহিমা দান করতে তিনি জীবাত্মার পরিচয়ে জীবনের বিশেষ প্রকৃতি ঘটে দেন। এজন্য একই উৎস হয়েও প্রতিটি জীবন হয়ে রয়েছে স্বতন্ত্র। প্রতিটি জীবনের নিজস্ব পরিচয় তৈরী হয় তার অস্মিতাকে কেন্দ্র করে। অস্মিতা আপাতভাবে ক্লেশ। সাধারণভাবে এর থেকেই মাথা চাড়া দেয় অহং। অহং একবার তৈরী হয়ে গেলে নানা আবেশ ও আবিলতায় ভরপুর হতে থাকে। ভিতরের অহংই তখন হয়ে ওঠে ভগবানের প্রতি দ্বন্দ্বী। অহং-এর প্রভায় জীবের মধ্যে এই প্রতিভাস গড়ে ওঠে যে সে অহংকে কেন্দ্র করেই হয়ে রয়েছে জীবনের গভীর প্রদেশের প্রভায় হয়ে উঠবে ভগবৎ প্রতিরোধী।

দিব্য সখার সঙ্গ মাধুর্যে ঃ হংসি ইব সখিভিঃ বাবৎ অভিঃ।।
অশ্ম এন মায়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিঃ অভিক্রনিক্রদৎ গা।
উত প্রাস্তীত উত চ বিদ্বান্ অগায়ত।। (ঋ. বে. ১০/৬৭/৩)

যখনই হয়েছে অনুভবের গভীরতা একান্তে সাধনের এই পথে।
এসেছে হৃদয় মাঝে দিব্য প্রবাহ সকল আবিলতা উন্মোচনে জগৎ মাঝে।
এমনই হয়েছে নিত্য পথের দিব্য আকর্ষণ সখার সন্ধি মাধুর্যে
নিত্য সনাতনের রূপময় প্রকাশের এই ক্ষণ পর্বের অনুভবে।
দিব্য সখা তুমি এসেছ জীবন মাঝে হয়ে ধ্রুব পরিচয়ে বৃত
যখনই হয়েছে উন্মুখ প্রাণ করতে বরণ তোমায় এসেছে প্রবাহ।
তোমারই ভাবনার এই দিব্য ভাব প্রবাহ করেছি বরণ একান্তে।
তোমারই নাম গুণ গানের যে অমর ধ্বনি হোক হৃদয়ে ধ্বনিত।।

দিব্য আলোর মালা ঃ

অবো দ্বাভ্যাং । পবঃ একয়া
গা গুহা তিষ্ঠন্তি অমৃতস্য সেতৌ।
বৃহস্পতিঃ তমসি জ্যোতিঃ ইচ্ছন্।
উদ্স্রাঃ আকঃ বি হি তিস্রঃ আবঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৭/৪)

দেবতার দান হয়েছে অবারিতে সাধন পথে উন্মেষে।
এসেছে যে জ্যোতি প্রভা দেবতায় করে বরণ স্বতঃই
এখন নিত্য পথের পথিক চলেছে করে অতিক্রম বাধার পর্ব।
দেবতার শক্তি হয়েছে যুক্ত সাধনের স্বতঃ উন্মোচনের পর্বে পর্বে।
যে ভাবপ্রভা দিয়েছে এগিয়ে দেবস্পন্দন জীবন পথের হয়ে সাধন শক্তি
এখন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে নিবদ্ধ মহাপ্রাণের বিশ্বাত্মায়।
ঐ আলোর মালা এখন হয়েছে ভাস্বর নিবেদনের এই ক্ষণে
হও তুমি এই জীবন মাঝে মূর্ত তোমারই মহিমায় হয়ে ভাস্বর।।

চৈতন্যময় এখন জ্যোতির্ময় ঃ ঐ আদিত্যমণ্ডলবাসী হিরণ্ময় পুরুষই পৃথিবীর উত্তরণ ঘটাবেন। তিনিই স্বতঃই হয়েছেন স্বয়ং বেদপুরুষ প্রভাময়, বেদপ্রজ্ঞার বীজ পুরুষ। তিনিই একদিকে ঋক ও সাম আবার অন্য মাত্রায় তিনিই যজঃ ও অথর্ব হয়েছেন। আদিত্য মণ্ডলেই তাঁর স্থিতি; আবার জগতময় তার বিকাশ। সেই তিনি আদিত্য মণ্ডলের জ্যোতির্ময় ও জ্যোতিঃস্বরূপ হয়েও ক্রম বিস্তারে সৃষ্টির নানা সুষমা ও ক্লিষ্টতায় সচকিত হয়েছেন। তাঁরই দিব্য জ্যোতির্ময় মনের বিরাট পটভূমিতে রচনা হয়েছে প্রকৃতির নানা সুষমা আর জীবনের স্বাধীন বিচরণের সূত্র ধরে চক্র বিকাশের চমকপ্রদ বিষয়াদির সন্নিবেশে। জীবনের চলার পথের ছন্দপতন কালের রথচক্রের উত্থান-পতনের ধ্বনি তার আকর্ষণ।

ইয়ম্ এর ঋক্ অগ্নিঃ সাম এৎ এতৎ এতস্যাম ঋচি অধ্যূঢ়ম্ সাম।
তস্মাৎ তৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম সাম গীয়তে।
ইয়ম্ এব সাঃ অগ্নিঃ অমঃ তৎ সাম।। (ছা. উ. ১/৬/১)

বহু বিচিত্র হয়েছে এই জীবন সমূহ। ভগবৎ থেকেই জাত আর ভগবত্তায় নিহিত হয়ে রয়েছে। জীবনের বহু পথের একত্রে মিলনের ক্ষেত্রটি। যে প্রাণ ঐ মহাপ্রাণ থেকে হয়েছিল জাত, তারই মধ্যে ছিল "নিহিত নবীনের স্পন্দন। যা কিছু জীবন মাঝে পরিপূর্ণতার আহ্বান নিয়ে আসে, যা কিছুর মধ্যেই ছিল নবীন চেতনের দিব্য মাধুর্য সে সবের সীমা করে অতিক্রম হয়েছে জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। জীবনের পথচলার মধ্য দিয়ে তৈরী হওয়া এই অভিজ্ঞতার সম্পদ জগতের জন্য পাথেয়। ভগবান ব্যতিরেকে এই পথ চলার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে নিত্য জাগরণের আহ্বান। যে দিব্য সম্পদ মানবের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় ফুটে ওঠে তারও অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে নিত্য নিরঞ্জনের দিব্য স্পর্শ। এই দিব্য স্পর্শ জীবনের মাঝে ফুটে উঠতে পারে যদি স্বতঃই জগতের পার্থিব বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা মাত্রায় হয়ে চলবে নিত্য জাগরণের সক্রিয় উদ্যোগ। যখন এই জাগরণের প্রদীপ হয়ে ওঠে দীপময় তার প্রকাশ পর্ব হয়ে গিয়েছে তখন বাঙ্ময় আর প্রয়াসী। এমন করে জীবনের চূড়ান্ত অভিযানের এই সত্য বিজয়ে সত্যকে সদাই হয়ে উঠতে হবে বিষয় মুখী। জীবনের এই শান্ত ও নির্বিচার অবস্থায় হয়ে উঠতে পারে প্রয়াস-নির্ভর প্রকাশ। ঐ প্রয়াসটিই হয়ে উঠবে জীবনের পথচলার কালপ্রবাহ। আদিত্য মণ্ডলের পরম পুরুষ এখন সাধকের হৃদয় মাঝে স্থিত ব্রহ্মচেতন স্বরূপ। চৈতন্যময় জ্যোতির্ময় পুরুষ এখন মূর্ত হবেন জগত মাঝে।

—ঃঃ—

ব্রহ্মপ্রজ্ঞায় ঈশ্বর স্বতঃবিভাষিত

তুলি চ্যাটার্জী

ঠাকুর বললেন, ভগবান লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জীবনের নিত্য যাপনে ভগবানকে বরণ করে, ধারণ করে এগিয়ে চলা। ব্রহ্মপ্রজ্ঞা লাভ করা, প্রজ্ঞাই স্বয়ং ব্রহ্ম রূপে প্রতিভাত হয় অন্তরে, যখন জীবন সেই প্রজ্ঞাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত বাতাবরণ গড়ে তুলতে পারে জীবনের অভ্যন্তরে। ঋষি বললেন—

যত বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
যেল যাতানি জীবন্তি/তৎ প্রাণা প্রবিশন্তি/তৎ ব্রহ্মণ ইতি।

এই সৃষ্টির প্রতিটি জীবনে, প্রতিটি জীবনের সম্ভানার মধ্যেও ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠান করে আছেন। তিনি সর্বময় হয়ে রয়েছেন। তিনি (Omnipresent) সর্বত্র বিরাজমান, (Omnipotent) সব সম্ভবনা হয়ে রয়েছে এবং omnicient (তিনি সব জ্ঞানের আধার হয়ে আছেন। তিনিই প্রজ্ঞা স্বরূপ। তিনিই স্বয়ং জ্ঞান। তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে অধিষ্ঠান করলেও, তাঁকে অনুধাবন করতে প্রয়োজন প্রস্তুতির, ঋক্ বেদের ঋষি বললেন বাক্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা। মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম/আবি- আবিঃ মে এধি। অর্থাৎ বাক্ ও মন দুই এক হলে তবে উপযুক্ত বাতাবরণ গড়ে ওঠে। মুখ মিশ্রিত বাক্ মনের পটভূমিতেই উত্থিত আবার যে বাক উচ্চারিত হয়েছে সেই বাক্-এর অভ্যন্তরে যেন মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্তর বাহির এক হয়ে আছে। এই সত্যের পটভূমিতেই ঋষি আহ্বান করেছেন ব্রহ্ম সনাতনকে। পতঞ্জলী মহারাজ বললেন অষ্ঠাঙ্গ সাধনের কথা— যম্ (সংযম), নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। সমাধি থেকে সূচনা হয় ভগবৎ যাত্রার, ভগবানের সঙ্গে মিলনের। তার আগে পুরোটাই প্রস্তুতি পর্ব। এই প্রস্তুতি কোনো বাহ্যিক প্রস্তুতি নয়, এই প্রস্তুতি অন্তরকে মালিন্য মুক্ত করে ভগবানের চরণে নিবেদন করার প্রস্তুতি। যম অর্থাৎ সংযম, বাহ্যিক সংযম নয়, অন্তরের সংযম। ষড় ঋপুর দংশন মুক্ত মন সংযমী, অবিচল মন। ইন্দ্রিয়ের সংযম ঠাকুর বলে দিলেন সহজ উপায় — বললেন পূর্বদিকে গেলে পশ্চিম আপনিই দূরে চলে যায়। অর্থাৎ ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে, অন্তর যখন ভগবৎ ভাবে বি গলিত হয় তখন অন্য সব ভাব মন থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। নিজ চেষ্টায় তা সম্ভব নয়। বরং ‘আমি’ চেষ্টা করে সংযম করব। এই বোধ অহং-এর জন্ম দেয়। ঠাকুর বার বার সাবধান করেছেন। সাধন পথে সাধুর অহং-ই সাধনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সাধুর অহং-ই সাধককে তার আরাধ্যর থেকে দূরে করে দেয়। তাই ঠাকুর পথ দেখালেন মাতৃ ভক্তির। ভগবানকে মাতৃ জ্ঞানে আহ্বান করা। ছোট শিশু যেমন তার মায়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, ঠিক তেমনই ঠাকুর বললেন মায়ের কাছে পূর্ণ নিবেদন। ভগবানের কৃপাই ভগবান লাভের একমাত্র উপায়। ভগবানের কৃপা ছাড়া ভগবান লাভ সম্ভব নয়। তাঁর কৃপা হলে তবেই তিনি প্রজ্ঞার দ্বার উন্মোচন করেন। সাধন পর্বের প্রয়োজন প্রস্তুতির জন্য কিন্তু তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে লাভ করা যায় না।

ভগবান সবাইকে এক একটি স্বাধীন মনের অধিকারী করেছেন। ভগবান স্বয়ং আদিতে সৃষ্ট হলেন এবং স্বইচ্ছায় বহুতে বিভক্ত হলেন।

একম্ এব সৃষ্ট। একম্ অদ্বিতীয়ম্। একম্ অগ্রে অবভৎ

তিনি বহুতে বিভক্ত হয়ে তাঁরই সৃষ্ট সব প্রাণে, আপাত অপ্রাণে অবস্থান করলেন। কিন্তু নিজে রইলেন আড়ালে। তিনি দ্রষ্টা রূপে, সাক্ষী রূপে, এবং কর্তা রূপে রইলেন। সব প্রাণের অভ্যন্তরে যে যে ভাবে চেয়েছেন তাকে তিনি সেই রূপে জাগ্রত হয়েছেন অথবা থেকেছেন আড়ালে। সব প্রাণেই তিনি দ্রষ্টা রূপে উপস্থিত, শুধুই দর্শন করে চলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ। জীবনের কোনো কর্মে, কোনো ভাবনায়, কোনো বিবেচনায়, কোনো ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ নেই তাঁর। সেই জীবন কর্ম-কর্মফল চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু জীবন মেনেছে তাঁর অস্তিত্বকে। যে জীবন তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছে, সেই জীবনের কাছে তিনি সাক্ষীরূপে অবস্থান করেছে, তিনি শুধু দ্রষ্টা নন, তিনি শুধুই অবলোকন করছেন না, বরং তিনি স্মৃতিতে ধরে রাখেন জীবনের কর্ম, উদ্দেশ্য ও মনেভাবকে। কিন্তু যে জীবন নিবেদিত হতে পেরেছে ভগবৎ চরণে। সত্যি সত্যিই শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় বরণ করে নিতে পেরেছেন ভগবানকে অন্তর মাঝে, সেই জীবনেই তিনি স্বয়ং হয়েছেন কর্তা।

আত্মানো রথীমামবিদ্ধি/শরীরম্ রথমেব তু।
বুদ্ধি তু সারথীবিদ্ধি/মনঃ প্রজ্ঞাহম এ বচ।

তিনি আত্মারূপে অবস্থান করেছেন, সেই জীবনের অন্তরে, সেই জীবন রথে তিনি রথারূঢ় হয়েছেন, সেই জীবনের জাগতিক

বুদ্ধি পরিবর্তিত হয়ে ভগবৎ বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। এই জীবনের দৃষ্টি, শ্রুতি, বিচার, বোধ, ভগবত্তায় বিধৃত হয়েছেন। এই জীবনের চালিকা শক্তি-মন, ভগবৎ মনে পরিণত হয়েছে। এই জীবন দিব্য জীবন, যে জীবনের কর্তা স্বয়ং ভগবান, আর এই জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান, এই জীবনের যা কর্ম সম্পাদন করে তা ভগবৎ কর্ম। এই জীবনের নিজস্ব কোনো পরিচয় থাকে না। এই জীবন ভগবানেই নিবেদিত জগৎ-এর মাঝে নিবেদিত জীবনটি আর পাঁচজনের সাথে মিশে দিব্য জীবন যাপন করে চলেছে। অন্তর মাঝে ভগবান সদা বিরাজমান। উজ্জ্বল এবং প্রকাশিত। এই জীবনই গড়ে উঠুক প্রাণে প্রাণে। জগৎ-এর মাঝে গড়ে উঠুক ঋষি সভ্যতা। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ, পরম ব্রহ্ম সনাতন গড়ে তোলো ব্রহ্ম উপলব্ধি, অন্তরে অন্তরে।

ওঁ নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়।

—ঃঃ—

কর্মযোগে ঈশ্বরলাভ

তানিয়া ঘোষাল

দিব্য প্রেরণা যকন প্রাণের কাছে আসে, সেই প্রাণ যদি তাঁকে চেপে নিতে সক্ষম হয়, তবে সেই মন যদি ঐ দিব্য প্রেরণা ধারণা উন্মুখ হন তম্বে সেই দিব্য প্রেরণা সেই প্রাণের মধ্যে স্থিত হয়ে, সেই প্রাণকে ধীরে ধীরে দিব্য ভাবধারায় নিষিক্ত করে তোলে। কিন্তু এই দিব্য প্রেরণাকে চিনে নেওয়া সব প্রাণের পক্ষে সম্ভব হয় না। ভগবানের কাছে কেউ ছোট, বড়, কেউ কম বেশি হন না। তিনি নিজেকে সবার কাছেই উজাড় করে দেন। কিন্তু কে তাঁকে চিনে নিতে, বুঝে নিতে সক্ষম হবে, অথবা কতটা হবে তা নির্ভর করবে সেই প্রাণের দিব্য প্রেরণাকে বরণ করার অভীপ্সত্রার উপর। এই অভীপ্সাকে বলা হয় ভাগবতী অভীপ্সা। তাঁকে চিনে নিতে, বুঝে নিতে, জেনে নিতে চায় তখন মন। ভাগবতী ইচ্ছাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয় এই মন। যে মন এতদিন জাগতিক নানারকম টানা পোড়েনে লিপ্ত ছিল এবার সে ভাগবতী পথে চলতে চায়। একটু কেটু করে সেই মনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে। মন যত তাকে গ্রহণ করতে থাকে ততই এই মনের চরিত্রের গঠনগত পরিবর্তন হতে থাকে। যে মন এতদিক জাগতিক বিষয়াদিতে সুখ খুঁজে পেত এখন সেই মনেরই রুচি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন এতদিন পরনিন্দা, পরচর্চা, সমালোচনা রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা হিংসাতে মন সুখ খুঁজে পেত এখন এসব সেই মনের কাছে আলুনি লাগে। মনের অণু পরমাণুর রসায়ন পরিবর্তিত হয়ে। মনের প্রেক্ষাপটে এই জগতের অগোচরে ঘটে যায় এক আমূল পরিবর্তন। কখন কখন সাধক নিজেও জানতে পারেন না এই পরিবর্তনের ররকথা। এই পরিবর্তনের ফলে জগতের প্রতি সাধকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মানুষটা বাহ্যিকভাবে একই থাকে। কিন্তু তার অন্তর্জগৎ অন্তর্দৃষ্টির এক সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে যায় যা সাধকে নিজ চরিত্রেও একটা বিপুল পরিবর্তন নিয়ে আছে। সাধকের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তার ধরন, কর্মের প্রকৃতি ধীরে ধীরে দিব্য রূপ ধারণ করতে থাকে। এই সময় সাধকের কাছে কর্মের সংখ্যা পাল্টে যায়। এতদিন কর্ম ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের মাধ্যম মাত্র। যে মাধ্যম দ্বারা নাম, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি টাকা-পয়সা, ইত্যাদি অর্জন করা যায়। সাধকের মনের প্রভাব প্রথম এসে পড়ে তার কর্মের উপর। মন যখন পরিবর্তিত হয়ে দিব্য রূপ ধারণ করতে থাকে তখন ঐ দিব্য মনের দ্বারা কৃতকর্ম ও দিব্য হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হল দিব্যকর্ম কি?

হয়েছি যুক্ত জগৎ কর্মে জগতের তরে
বহুবিধ সংস্কারে তোমার পথের নিরীক্ষে
এমন সময় হয়েছে নতুন করে ভেবে নেবার
যা কিছু ছিল প্রাচীন কর্ম, জগৎ কর্মের
অধীনে হয়েছে সকল তোমার কর্ম
তোমার সেবার এক অনুপম অপরূপ আবিষ্কার
জগৎ কর্মেরে করেছি তোমার কর্মে নিরূপণ
সকল কর্মের নিজরূপ ধারণ হয়েছে এখন
তোমার রূপ সঞ্চারী জগতের বুকে তোমাকে
বরণ করবার কর্মব্রতে হয়ে সদাই কর্মবিজয়ী
(বেদবিজ্ঞানের গভীরে, ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-২১২)

দিব্যকর্ম আলাদা কিছু নয়, এ হল জগৎ কর্মেরই আরেক রূপ। আসলে জগৎ কর্ম রূপান্তরিত হতে পারে দিব্য কর্ম। একটি সাধারণ জগৎ কর্ম দিব্য কর্মে রূপান্তরিত হতে পারে কর্মযোগের পথে হেঁটেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন একটি বাড়ির ছাদ আছে। সেই ছাদে ওঠা সবার লক্ষ্য। কেউ সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠছে, কেউ মই বেয়ে ছাদে উঠছে, কেউ আবার দড়ি বেয়ে ছাদে উঠছে। লক্ষ্য একই কিন্তু পথ ভিন্ন ভিন্ন। সাধক প্রাণের আধার অনুযায়ী পথ নির্ধারিত হয় এবং অন্তিমে সব পথ মিলেমিশে একাগকার হয়ে যায়। প্রধান লক্ষ্য ভগবানকে পাওয়া, কিন্তু তাঁকে পাওয়ার পথ রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, তন্ত্রের পথ, বৈষ্ণব, শাক্ত, এই নানারকম।

সুখ দুঃখ সমে কৃত্ত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈব্য পাপমাবাপ্স্যসি
কর্মণ্যে ব্যধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচেন,
মা কর্মফল হেতুর্ভুর্মা তে সঙ্গোহস্তকর্মনি
যোগস্থ কুরুকর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভুত্বা সমত্বং যোগঃ উচ্যতে।

—ঃঃ—

ভক্তিতেই ঈশ্বর লাভ

বুকু বসু

ভক্তি হল ভগবানের প্রতি এক প্রগাঢ় ভালোবাসা যা সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্ম-নিবেদন দিয়ে। ভক্তি হল ভগবানের সহিত এক নিগূঢ় সম্পর্ক বিন্যাস যা ভক্তকে তাঁর ভগবানের সাথে এমনভাবে অন্বিত করে দেয় যে ভক্ত তার ভগবানময় সর্বত্র দেখে। তিনি ছাড়া যে আর না কিছু বোঝে, তিনি ছাড়া সে আর না কিছু জানে, যাহাই দেখে সে তাঁকেই দেখে। সর্বত্র উনি সর্বদা উনি হয়ে থাকেন। ভক্তের ভগবৎ ভালোবাসা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ক্রমবর্দ্ধমান সবসময়। ভক্ত মনের আগোচরেই ভগবৎ আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অদৃশ্য টান একমাত্র ভক্ত উপলব্ধি করতে পারে। এই আকর্ষণ ভক্ত ভগবানের সম্পর্কের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই আকর্ষণ এত বেশী প্রখর যে কোন জাগতিক সম্পর্কের টানকে সহজেই উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারে ভগবানের দিকে।

ভক্তের ইচ্ছার মূল্য ভগবান দেন। পূরণও করেন। ভগবানের ইচ্ছাটি যখন ভক্তপ্রবর জানতে পারেন সে সময়টি হয়ে ওঠে ভক্তের বিকাশ সম্ভবনা। ভক্ত যদি ইচ্ছা করেন জগতের সম্পদ, জগতের সাপেক্ষে তাহলেও ভগবান যেটি বাতিল করেন না। তবে ভক্ত ইচ্ছা যদি ভগবৎ অনুসারে হয় তবেই তা হয় শ্রেষ্ঠ। ভক্ত হতে হলে ভগবানকে জানতে হয়, বুঝতে হয়। ভালোবাসা চায় তাকেই যাতে জানা যায়, যাকে বোঝা যায়। ভগবান যদি দূরের বস্তু হয়ে থাকেন তবে জানা বা বোঝা হয়ে ওঠে দুরূহ। জানা যায় না, বোঝা যায় না। দূরের বস্তুকে দেখাও যায় না, সাধারণত। দূরের বস্তু তিনি নন, এই প্রত্যয়ের উপরই ভক্তকে স্থিত হতে হবে। দূরের নন, কাছের— এমনই শ্রদ্ধা প্রয়োজন।”

(ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদ বিজ্ঞানের গভীরে, পৃঃ ৫৭৬).

ভগবানকে সাথে সম্পর্ক বিন্যাসে ভগবান হন একদম সবচেয়ে কাছের একজন। যে কোনো জাগতিক সম্পর্কের থেকেও কাছের তাঁর সাথে অন্বয় সে যেখানে নেই কোন হিসাব নিকাশ নেই কোন রীতি-নীতি আচার-বিচারের বাঁধন আছে শুধু তাঁর সাথে। সম্পর্ক বিন্যাস, সর্বদা মনের যুক্ততা। তাঁর প্রতি যত সমর্পণ বাড়বে তিনিও তত উন্মুক্ত হতে থাকে ভক্ত সম্মুখে। ভক্ত সর্বদা যদি হৃদয়ে তাঁকে নিয়েই বসে থাকে তাহলে তিনি হয়ে যাবেন জীবনে একমাত্র। অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তখন তিনি। নিবেদিত প্রাণ। এখন মনের-কামনাবাসনা-আকাঙ্ক্ষা-র দায়ভার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ভগবানকে গ্রহণ করতে বলছে। মন অচঞ্চলতা থেকে স্থির ও দৃঢ় হবে অন্তর্মুখী হয়ে উঠবে তার ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসারী হবে। ভাগবতী এই যাত্রাপথ তো সুন্দর ও মসৃণ হবেই। তাই তো যাত্রাপথেই আনন্দ, আনন্দ তাঁর সহচর্য্যের। এখন আবার নতুন করে তাঁকে আবিষ্কার করা নিত্যই নবীন রূপে।

—ঃঃ—

ব্রহ্মপথিকের ব্রহ্মবিস্তার

সায়ক ঘোষাল

ভগবান প্রদত্ত যেই কাজই হোক সেটিই ভক্ত ব্রহ্মানন্দে সেই চরম অবস্থায় থেকে পরম আনন্দের সাথে সেই কর্ম সম্পাদন করে। এ যেন মনের নিয়মিত আহার হয়ে যায়। কে বলে আবার আলাদা করে স্বর্গের কথা? এ জীবন ধারণ কারী শরীর যেন একটি গোটা স্বর্গ হয়ে যায় যার মধ্যে সবসময় ভগবৎ কীর্তন হয়ে চলেছে। যার মধ্যে পরম আনন্দের সম্ভার রয়েছে। তখন ভক্ত মন হয়ে যায় উর্জিতা ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

ব্রহ্মভাব যুক্ত এমন মন হয়ে যায় একজন সম্পূর্ণ দৈব চরিত্রেরও উর্দ্ধে। সর্বত্র বিরাজিত তিনি অন্তরের সবচেয়ে প্রিয় আপনজন হয়ে তখন বিরাজমান করবেন। জাগতিক দিক মনের মাঝে বাধা হয়ে আসতে পারে কর্মের পথ ধরেও, যেমন—খ্যাতি, যশ, কীর্তি, স্বীকৃতি। কতটা কাজ করে কতটা স্বীকৃতি পেলাম আর সাফল্য না হলে স্বীকৃতি হারাবার ভয় মনকে বিষাক্ত করে তোলে। স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা অতিব নাশ জনক একটি সংক্রমন। যার স্বীকৃতির, খ্যাতি যশের আকাঙ্ক্ষা আছে ভগবৎ পথে তার স্থান নেই। কারণ স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা জনক ব্যক্তি মনে মনে ভগবানের কীর্তন করবে কী—সে নিজের প্রশংসার কথাই সারাক্ষণ ভেবে যায়। ব্রহ্মপথে অত্যন্ত ভক্তির সাথে সেই থাকতে পারে যার কাছে ভয়ের কোনো কিছু প্রকারই না থাকে। সম্পূর্ণ নিবেদিত মন যে মন চলে গেছে সবকিছুর অতীত সেই পারবে। সেই ভক্তের হবে তখন শুধু ব্রহ্ম আচরণ এবং ব্রহ্মচরিত্রে ভরপুর। এই ভক্তই এবার ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে জগতের মাঝে প্রজ্ঞার সঞ্চারে। উন্মুক্ত করবে তার সমস্ত চেতনার সম্ভার। এই ব্রহ্ম প্রজ্ঞার আহ্বানে। এই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি থাকেন একদম সাধারণ। সবার সাথে থেকে সবাইকে একভাবে কিন্তু চেতনা থাকে তার মনের গভীরে, ভক্ত সব সময় তার আরাধ্যের কথা ভাবছেন। সে যে কাজের জন্য ভগবানের যে উদ্দেশ্যের জন্য যেখানেই যাক সেই কাজ ছাড়া তার অন্য কোথাও মন বসবে না। এইটি হল তার ব্রহ্ম কর্মের প্রতি সম্পন্ন। যেখানে ভগবান রেখেছে সেখান থেকে সে সরবে না। এ যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বলা বিড়াল ছানার কথা—বিড়াল যেখানে তার ছানাকে রেখে দেবে সেখান থেকে সে সরবে না যতক্ষণ না মা তাকে মুখে করে অন্য কোথাও না রাখে। ভগবানের আর ভক্তের সম্পর্কটিই এইরকম। একবার হৃদয় অভ্যন্তরে ভগবৎ স্বত্তার সেই নন্দিত কম্পন হলেই হৃদয়ের সেই চেতনা উন্মুক্ত হয়ে যায় ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে। এখন ভগবান আর স্বার্থের ভালোবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, শুধুই অহেতুকী ভক্তিতে ভালোবাসায় সৃষ্টি হয় ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক। বাকী সমস্ত মালিন্যের পাহাড় শূন্য হয়ে যায় এই ভক্তি ভালবাসার সম্পর্কে। ভক্তের এখন নতুন জন্ম একই জগতে একই শরীরে। নতুন চরিত্রের নতুন গুণে বিদ্যমান হবে ভক্ত এ জগৎ মাঝে। প্রতিনিয়ত সে জগতের মধ্যে ব্রহ্মানন্দের স্নানে নিমগ্ন হবে। কিন্তু ভগবৎ পথে থাকা ব্যক্তির চরিত্র সরল এবং করুণাপূর্ণ থাকেন। তাই জগতে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা কম নেই যারা এরকম ধরনের সরল ব্যক্তিদেরকে নিজের স্বার্থ লাভ এবং সুযোগ সুবিধা অথবা আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই ঠাকুর বলেছেন ভক্ত হবি, কিন্তু বোকা হবি কেন, ভক্ত হবে তো সিংহ ভক্তের মতো যে দরকার পড়লে ফোঁশও করবে এবং করুণাশীলও থাকবে। কিন্তু কখনো কারর ক্ষতি করবে না। ভগবানের প্রিয় ভক্তদের একটিই উদ্দেশ্য ভগবৎ লাভ এবং ভগবৎ বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া জগত মাঝে। হে প্রভু প্রার্থনা করি তোমার কৃপায় যেন তোমার ধ্যানে তোমার নাম গুণগানে ডুবে থাকতে পারি।

—ঃঃ—

গায়ত্রী মন্ত্রের সাধন উপলব্ধি

স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের ছোট একটি কল্পনা করা যাক—ধরুন মানুষের মন আর ঈশ্বরের মন—তাঁদের মধ্যে আছে এক সুক্ষ্ম বেতার বার্তা প্রচার পদ্ধতি। এবং এই বার্তা প্রচারিত হচ্ছে একটি মাত্র চ্যানেলে। কেমন করে প্রচারিত হয় ঈশ্বরের বার্তা? এক বিশেষ স্পন্দনের মাধ্যমে, যে স্পন্দন সর্বত্র বিরাজমান—সেই স্পন্দন শুধু ধরতে পারে এমন মন যার সুর বাঁধা রয়েছে ওই বিশেষ স্পন্দনের সুরে। অনেকটা রেডিও-সিগনালের মতো রেডিয়োর ডায়ালে কাঁটা ঘুরিয়ে আমরা বিশেষ স্টেশন বা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বার্তা ধরতে পারি। বিশেষ স্টেশনের বিশেষ স্পন্দনে সঙ্গে টিউনিং ঠিক না থাকলে তো সিগনাল ধরা যাবে না, কেন্দ্রটির প্রচারও ধরা সম্ভব হবে না। মানুষের মনও ঠিক রেডিয়োর মতো। —মহা জাগতিক মন থেকে পাঠানো সিগনাল ধরতে গেলে আমাদের মনেরও

সঠিক টিউনিং প্রয়োজন। সমস্যা হল, আমরা বেশিরভাগ মানুষই মহাজাগতিক মনের স্পষ্ট সংকেত ধরতে পারি না, কারণ আমাদের মনের টিউনিং ঠিক নেই। এই সুর মেলানোর কাজটা করতে হবে আমাদের মনকে। যতদিন সেটা না হচ্ছে মহাজাগতিক প্রচারের স্টেশনটাকে আমরা হয়তো ভুলেই থাকব। সিগনাল না পেয়ে আমাদের মনে হতে পারে, ওই স্টেশনটাই হারিয়ে গেছে।

জপের মাধ্যমে সমর্থ সত্তার সাথে সংযুক্ত হবার পর যে কোন সাধারণের পক্ষে অসাধারণ হয়ে ওঠার সুযোগ ঘটে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করার পরই আলো, পাখা, হিটার, কুলার ইত্যাদি বৈদুতিক উপকরণগুলি নিজেদের কাজ করতে পারে। ট্যাঙ্কের সাথে জুড়ে রাখলেই কলের জল ততক্ষণ অবধি বইতে পারে যতক্ষণ ট্যাঙ্কের জল খালি না হচ্ছে। চাঁদ সুর্যা লোকের দ্বারাই আলোকিত হয়। হিমালয়ের সাথে জুড়ে থাকা নদীর জল কখনো শুখায় না। পুলিশের অধস্তন একজন সেপাইও নিজেকে প্রশাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি মনে করে মাথা উঁচু করে চলা ফেরা করে। এটি কেবল সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। —সমর্থতার সাথে জুড়ে যাবার পর অসমর্থতাও সমর্থতায় বদলে যায় নোংরা নালার জল গঙ্গায় মিশে যাবার পর গঙ্গার সমান সম্মান পায়। গাছের আশ্রয় পেলে পরগাছা লতাও গাছের সমান উচ্চতায় আরোহণ করতে পারে, সাধারণতঃ সে তার নিজের ক্ষমতায় মাটিতে লুটিয়ে থাকে। —অশিক্ষিত, নির্ধন ঘরের মেয়ের যদি কোন বিদ্বান অথবা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে বিবাহ হয়, সেক্ষেত্রে তার সম্মান ও বৈভব তার স্বামীর সমানই হয়ে থাকে। —এধরনের উদাহরণ সাধারণতঃ ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করার বিষয়ে দেওয়া হয়।

গুরু বৃহস্পতির পথ প্রদর্শনের দ্বারা দেবতারা দেবত্ব প্রাপ্তি করতে সক্ষম হন এবং শুক্রাচার্যের অনুগ্রহে অসুরদের পক্ষে ভৌতিক সিদ্ধিলাভ করার সুযোগ হয়েছিল। এই সমস্ত সুফল তারা উভয়ে কেবলমাত্র নিজেদের ক্ষমতার দ্বারা কোনমতেই লাভ করতে পারত না। গুরুর নির্দেশিত পথ এবং শক্তির অনুদান তথা শিষ্যের শ্রদ্ধা এবং পুরুষার্থের সংযোগের ফলেই বিস্ময়কর পরিণাম উৎপন্ন হয়ে থাকে।

আমরা দেখেছি, জগন্মঙ্গল-সাধনই ব্রাহ্মণের মুখ্য যক্ষণ-জগন্মঙ্গল সঙ্কল্প মন্ত্র মানে নিরন্তর জপ করা-ব্রাহ্মণের গায়ত্রীতে অধিকার -এ কথা যেমন সত্য, আবার একথাও সত্য, গায়ত্রীর সাধনা অব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের সূচনা করে। এই মন্ত্র বারবার উচ্চারণ করতে করতে এবং এই মন্ত্রার্থ অনুধ্যান করতে করতে নিজের প্রয়াস-রুচি-প্রবৃত্তি তদানুসারী হয়।

গায়ত্রী মন্ত্র হল জ্যোতির্ময়ের বাণী, আলোকের দিশারী। হেমন্তের ঘোর অমাবস্যার নিশীথে আমরা যাঁর আরাধনা করি, তিনি দীপান্বিতার মহাদেবী মহাকালী —তিনি গায়ত্রীরই প্রতিমূর্তি-বরাভয় দাত্রী, আলোক প্রদায়িণী, শক্তি সঞ্চার কারিণী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দিব্য জ্যোতির্ময়ীর আবির্ভাবেই দীপান্বিতার সার্থকতা। ভর রাত দুপুরে অন্তর্লোকের আসনে সবিতার ভর্গ তেজকে সাধক নামিয়ে আনেন।

শ্বাসে প্রশ্বাসে প্রণব জপ করবার পূর্বে জ্যোতিধ্যানের মধ্যে দিয়ে মন প্রাণ সহ সমগ্র সত্তাকে এককেন্দ্রিক করে নিয়ে তারপরে প্রণব সাধনে নিমগ্ন হতে হয় সাধন করতে করতে দেখা যায় সেই জ্যোতির্ময় তেজের কেন্দ্রবিন্দুতে জলদগ্নি প্রণব বিদ্যমান অর্থাৎ আলোর ছটা এবং তেজের বিভা সবই প্রণবের। শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রণব জপ সাধকের সাধনার পরিণতি ঘটায়।

এই জ্যোতি বা তেজ হ'ল প্রখর, অত্যন্ত প্রখর। এতই প্রখর যে, তাঁর দিকে সরাসরি তাকানো যায় না। হীরকের ঠাণ্ডা জ্যোতি নয়।

ব্রহ্মগায়ত্রীর জ্যোতির তেজ হল প্রখর। ইষ্টরূপী প্রণব মন্ত্র অনুরূপ তেজস্বী। সিদ্ধ সাধক অচিরেই সেই তেজস্বিতার সঙ্গে অভিন্ন হন।

—চিতা যখন হু হু করে জ্বলে তখন তার তেজ এবং আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। সেই পরমোজ্জ্বল নীরবতার মধ্যে অগ্নির লোলজিহ্বা অনাহত নাদ ব্রহ্মই সমুচ্চারণ করে চলে। চিতায় অগ্নি সংযোগের সময়ে সমস্বরে ব্রহ্মগায়ত্রী গীত হয়। কিন্তু আগুন যখন প্রজ্জ্বলিত হয়ে দাহ কার্য্য আরম্ভ করে, তখন অগ্নি লেলিহান শিখার স্পন্দন ও কম্পনের সাথে সাথে শ্বাসে-প্রশ্বাসে ওঙ্কার জপ চলতে থাকে স্থূল জীবদেহ আদিভূত প্রণব দেহে উত্তীর্ণ হয়।

চিতাগ্নিতে দেহ যবে ভস্মীভূত হবে।
চিতাগ্নির শব্দে তুমি ওঁ ধ্বনি শুনিবে।।
দেহ ধ্বংস হইলেও নামে রবে তুমি।
অনন্ত ব্যোমেতে রবে ছাবি মর্ত্তভূমি।।

পূর্বজ আচার্য্যগণ গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও উপাসনা দ্বারা নিজ নিজ অদ্ভুত ও অলৌকিক শক্তি লাভ করেছিলেন। ঐ মন্ত্রপ্রভাবে যাকে তাঁরা যে আশীর্বাদ বা বরদান করতেন তা ফলবতী হত।। এই গায়ত্রীরই প্রভাবে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে ব্রহ্মর্ষি হলেন।— দুর্বাসাদি ঋষির পরাক্রমের মূলে ছিল গায়ত্রী সাধনা। রামানুজাচার্য্য, নিম্বার্কচার্য্য, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য এই গায়ত্রী প্রভাবেই বিবিধ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একমাত্র গায়ত্রী সাধনা করলে আর কোন কিছুর জন্য সাধককে অপেক্ষা করতে হয় না; সাধকের সর্বাভিষ্ট লাভ হয়।

—ঃঃ—

শ্রী অনির্বাণ স্মৃতি সংগ্রহ

আশুরঞ্জন দেবনাথ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর। ২৫।২।৬৯ মঙ্গলবার—সপ্তদশ দর্শন।

পণ্ডিচেরী থেকে ফিরলাম বেলা বারোটায়। তৈরী হয়ে নরেন্দ্রপুর পৌঁছুলাম। সোয়া চারটায়। দু'রাত দুদিন ট্রেনে কাটিয়ে তারপর এই দীর্ঘ পথ বাসে এসে শরীর ক্লান্ত-অবষণ্ণ হলেও মন উন্মুখ —স্বামীজির দেখা পাব। বাস থেকে নেমে ছুটলাম হৈমবতীর দিকে। আফসোস হচ্ছিল দেরী হয়ে গেল বলে। স্বামীজি সময় দিয়েছিলেন চারটায়।

গিয়ে দেখি স্বামীজি বাগান পরিচর্যায় রত। স্বামীজি, মালী ও আরেক ভদ্রলোক তিন জনে ফুল গাছে জল দিচ্ছেন। গাছে গাছে নানা ফুল। বৃষ্টির অভাবে সব ম্রিয়মান। স্বামীজি আমায় বসতে বললেন। আমি ঘুড়ে ঘুড়ে বাগান দেখলাম। সন্ধ্যা হয়ে এল। স্বামীজি এসে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসলেন। আমরাও বসলাম। বসন্তের এই আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণটুকু কি অপরূপই না লাগছে! চারদিকে কি বিরাট প্রশান্তি, কি বিপুল স্তব্ধতা! গাছে গাছে সবুজের সমারোহ, নানা রঙের ফুল, পাখির কাকলি। সর্বোপরি স্বামীজির প্রশান্ত মহিমাময় উপস্থিতি! সমস্ত গ্রামটাই যেন একখানি পটে আঁকা ছবি। ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড় বাংলার পল্লী। মনে পড়ে কৈশোরে ছেড়ে আসা পূর্ববাংলার পল্লী-স্মৃতি। সে ছিল আরও নিবিড়, আরও গভীর।

স্বামীজির সাথে কথা বড় একটা হয়নি। ক্ষণিকের এ পুণ্য সান্নিধ্যটুকুও দুর্লভ। প্রথমে আমরা তিনজন ছিলাম। তারপর এক ভদ্রমহিলা এলেন। পরে বুঝলাম উনি সুধা বসু। সম্ভবত, 'বর্তিকায়' স্বামীজির ভাষণ অবলম্বনে 'শ্রীঅরবিন্দ দর্শন' এর লেখিকা। যা পরবর্তীকালে পুস্তকারে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজির সাথে পণ্ডিচেরী সম্পর্কে দু'চার কথা হল। জিজ্ঞাসা করলেন কবে যাব। বললাম আগামী পরশু বৃহস্পতিবার আবার আসব, যাব তারপর। স্বামীজি বললেন, 'এস, আজ তো কথাবার্তা বিশেষ কিছু হল না। সেদিন বরং তিনটায় এস। তারপর শনিবার বিকালে কেয়াতলায় আসতে পার। সন্ধ্যা সাতটা বাজলে প্রণাম করে সবাই ওঠলাম। প্রণাম করতেই স্বামীজি বললেন, এস, আজ তো তুমি খুব ক্লান্ত। তারপর এতটা পথ বাসে যাবে।' আসার আগে স্বামীজির কাছ থেকে নির্মাল্য চেয়েছিলাম—একটা গোলাপ।

সুধাদেবী তাঁর নিজের গাড়ীতে ফিরছেন। আমাকেও কিছু পথ এগিয়ে দিবেন বলে স্বেচ্ছায় তুলে নিলেন। উনি প্রথমে গেলেন গড়িয়ায় স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের আশ্রমে তাঁকে দর্শন মানসে। আমাকেও আসতে বললেন মহাপুরুষ দর্শনে। আমি যাই নি। হয়তো বা ক্লান্ত ছিলাম বলে। আজ বড় অনুতাপ হয় মহাপুরুষ দর্শনের সে সুবর্ণ হেলায় হারিয়েছি বলে। তারপরও পূজনীয় প্রত্যগাত্মানন্দ মহারাজ চার বছর স্বদেহে ছিলেন; দেহ রাখেন ২০।১০।৭৩ সালে ৯৪ বছর বয়সে। এই সুদীর্ঘ সময়ে এই পথে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছি। আসলে এখনো স্বামীজিকে তেমন করে-জানতাম না; ওনার লেখার সাথে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। পরবর্তীকালে শ্রীঅনির্বাণের সাথে নানা সৎ-প্রসঙ্গে পূজনীয় প্রত্যগাত্মানন্দজী ও ওনার প্রণীত গ্রন্থাদি সম্পর্কে জানতে পারি। কোনও এক সন্ধ্যায় কথা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছিলেন যে তিনি, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী ও কাশীর গোপীনাথ কবিরাজ একই পথের পথিক। নীরবে নিভৃতে তাঁরা তাঁদের আপন আপন কাজ করে, যাচ্ছেন একই উদ্দেশ্যে। তাতেই মনে হয় তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় ছিল। কাশীর কবিরাজ মহাশয়ের সাথে স্বামীজির সাক্ষাতের ছবি আছে। সংস্কৃত কলেজ প্রকাশিত স্বামীজির 'বেদ মীমাংসা' গ্রন্থ সম্পর্কে কবিরাজ মহাশয় প্রশংসা করে লিখেছেন। " Master production of mature mind." স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ মহারাজের সাথে স্বামীজির সাক্ষাতের কোন বিবরণ পাই নি। তবে প্রত্যগাত্মানন্দজী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'জপসূত্রম চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্ট শ্রীঅনির্বানের "জপ যজ্ঞ" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সংযুক্ত করেছেন। বিখ্যাত গ্রন্থ "জপসূত্রম" ছয় খণ্ড ছাড়াও স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর ১) অদ্বৈতাদ্বৈত দশকম, ২) হিন্দুষড় দর্শন, ৩) পুরাণ ও বিজ্ঞান, ৪) বেদ ও বিজ্ঞান, প্রসিদ্ধ-গ্রন্থ। তাছাড়া রয়েছে পূর্বাশ্রমের শ্রীপ্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা "ইতিহাস ও অভিব্যক্তি"।

পূর্বাশ্রমে তিনি মনস্বী দার্শনিক রূপে সুপরিচিত ও বিশিষ্ট অধ্যাপক রূপে প্রখ্যাত ছিলেন প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় নামে। পরে সন্ন্যাস আশ্রমে পরিচিত হন স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী রূপে। জন্মেছিলেন বর্দ্ধমান জেলার কাটোয় মহাকুমার অন্তর্গত চাণ্ডুলি গ্রামে। প্রসঙ্গ মনে পড়ে স্বামীজির পুণ্য জন্মস্থান চাণ্ডুলি গ্রাম দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার-এক বাল্যবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কোনও এক সকালে আমাদের কাটোয়ার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়েছিলাম। প্রত্যগাত্মানন্দ স্মৃতিধন্য চাণ্ডুলির উদ্দেশ্যে। গ্রাম্য-মেঠো পথ। চাণ্ডুলি গ্রামের এক প্রান্তে একটি মন্দির, মন্দিরে নানা দেবদেবীর মূর্তি। মন্দিরটি স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের স্মৃতিতে গ্রামবাসীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সহজ সরল গ্রামবাসীরা স্বামীজির নামে শ্রদ্ধাবনত। কিন্তু ওনার লেখা ও দর্শন সম্পর্কে খুব একটা ধারণা নাই।

বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি ত্যাগ করে স্বদেশী ধারায় শিক্ষাদানের উদ্দেস্যে যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) স্থাপিত হয় শ্রীঅরবিন্দের অধ্যক্ষতায় ও আচার্য্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, তাতে প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় যোগ দেন রিপণ কলেজ ত্যাগ করে। কিন্তু দেশোদ্ধারের ব্রত তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি, যেমন পারেনি শ্রীঅরবিন্দকে। শ্রীঅরবিন্দ ও সতীশচন্দ্রের সহকর্মী এই প্রমথনাথ ও চিহ্নিত ছিলেন অধ্যাত্মসাধনার জন্য তাঁদেরই মত।

*** *** ***

নরেন্দ্রপুর। ২৭ শে ফেব্রুয়ারী '৬৯ ; বৃহস্পতিবার। অষ্টাদশ দর্শন

তিনটার মধ্যেই হৈমবতী নরেন্দ্রপুর পৌঁছুলাম। স্বামীজি ঘরে টেবিলে লেখাপড়া করছেন। আমি যেতেই ডাকলেন। প্রমাম করে টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলাম। খানিকক্ষণ নীরব থেকে স্বামীজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল তোমার কি বলার আছে'। পণ্ডিচেরী প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করলাম। বললাম, স্বামীজি, নিজেকে মেলে ধরা কি? আপনি থাকে আকাশভাবনা বলেন তাই নয় কি?' স্বামীজি বললেন, 'হ্যাঁ, তাই'। বললাম, 'পণ্ডিচেরীতে অসংখ্য ভক্ত দর্শনার্থীদের সান্নিধ্যে এসেছি। দেখেছি তাদের প্রত্যেকেরই শ্রীমায়ের উপরে অকুণ্ঠ ভক্তি বিশ্বাস। ওরা প্রত্যেকেই নাকি মায়ের কৃপা অনুভব করে। শ্রীমাই স্বয়ং ভগবতী এ আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেনা পারলেও মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, এতটুকু কম নয়। আশ্রমের ধ্যান কক্ষে, আশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতপাশে—বিশেষ করে মায়ের দর্শন দিনটিতে ধ্যানে বসে নিজেকে মায়ের কাছে মেলে ধরতাম। তাছাড়া প্রায় সর্বক্ষণই তাতে সমুদ্রের ধারে, আশ্রমে কিংবা আবাস কক্ষে যেখানেই থাকি না কেন নিজেকে উন্মুক্ত রাখতে চেষ্টা করতাম— আকাশের মত, সমুদ্রের মত। আর মনে মনে প্রার্থনা করতাম, 'মাগো,তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; আমার মধ্যে তোর শক্তিই কাজ করুক। কিন্তু স্বামীজি, আমি তেমন কিছু বিশেষভাবে অনুভব করতে পারিনি। অথচ আর সবাই বলছে তারা মায়ের কৃপা, মায়ের শক্তি অনুভব করছে। তাই এতসব ভক্ত সমাবেশে নিজেকে বড় হীন মনে হয়েছে। স্বামীজি সবটাই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শুনে বললেন, ওসব ভীড়ের অনুভব সাময়িক। পণ্ডিচেরী ছাড়লে আবার যেই কে সেই। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি অনেক নিয়ে এসেছ। মা তো সর্বত্র, শুধু পণ্ডিচেরী কেন? এবারে মরে বসে বল, 'মা তুমি এখানে এস; আমি আর অতদূরে যেতে পারব না।' মায়ের দর্শন নিয়ে কথা উঠলে স্বামীজি বললেন, 'বিকালের স্নান আলোয় Mother কে বেলকনীতে বড় ভাল লাগে। চোখে-মুখে একটা দিব্য আভা। কাছে গিয়েও এত ভাল লাগে নি।' *** ***

স্বামীজি ব্যাষ্টির আত্মোন্নতির উপরই জোর দিলেন। বললেন সমষ্টির ভাবের আনন্দ সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রসঙ্গত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বললেন। বললেন চারশ বছরে সে মহান ধর্ম আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের কথা উঠল। বললাম রবীন্দ্রনাথ আমার খুব ভাল লাগে। ঘোর তরীর 'মানস সুন্দরী' পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যাই। স্বামীজি বললেন, পড়বে, খুব পড়বে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমায় লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি তথাকথিত অনেকে বৈদান্তিক সাধকের অনুভূতির চাইতে স্বচ্ছ। কৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়েই সত্যকে পাওয়া যায়, তা নয়। সহজের ভিতর দিয়েও পাওয়া যায়। আর সে পাওয়াই সত্যকার পাওয়া। বেদে ঋষি, কবি আর ভগবানে কোনও তফাত করা হয়নি। সব ঋষিরাই কবি। আমার রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছে ঋণের চাইতে কিছু কম নয়। বরং রবীন্দ্রনাথকেই বেশি আত্মীয় বলে মনে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'যত মত, তত পথ।' তাঁর কোনও মতুয়ারি বুদ্ধি (dogmatism) ছিল না। রামকৃষ্ণ নিরাকায় ব্রহ্মবাদীদেরও মান দিয়েছেন। বিয়ে করে দাম্পত্য জীবনের এক অদ্ভুত আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। সারদাদেবী রামকৃষ্ণ বউ ঠিক নয়—ঠাকুরই বলেছেন, 'ও আমার শক্তি'। সারদার কামগন্ধহীন প্রেম রামকৃষ্ণকে উদ্‌বুদ্ধ করত, উদ্দীপ্ত করত। তাই তিনি রামকৃষ্ণের শক্তি, তাঁর সিদ্ধি, ভবতারিণীর ষোড়শী কলা। কয়টা বউ আত্মানি হয়?

সারদাদেবী রামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারে জীবন দিয়েছেন। কত হাজার হাজার নরনারীকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন তার লেখাজোখা পাই। তবে তিনি কলকাতার স্টেজে বক্তৃতা করেনি বটে।

অরবিন্দের মত অগাধ পাণ্ডিত্য রামকৃষ্ণদেবের ছিল না। প্রায় নিরক্ষর গেঁয়ো মানুষ হয়ে ভারতবর্ষের প্রাণকে তিনি যেমন ভাবে ছুঁয়ে আছেন আজও— এমন কেউ পারেননি। ঈশ্বর যেমন dogmatic নন, ভালমন্দ সবই হয়েছেন, রামকৃষ্ণ তেমনি। কথামৃত অনর্গল বলে গেলেন। মনে হল যেন কথামৃত সমস্তটাই স্বামীজির মুখস্ত। মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন। প্রথম সাক্ষাতেও স্বামীজি বিশেষভাবে বলেছেন নিয়মিত কথামৃত পড়তে।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললাম, "স্বামীজি, আপনি বলেছেন, 'নারীকে দেবী কয়।" দেবতার প্রিয়করি, প্রিয়ারে দেবতা। সব সময় সে ভাবনায় থাকতে পারি না। মাঝে-মধ্যে কামনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং কল্পনার সম্ভোগে ভেসে যাই। পরে অবশ্য স্বাভাবিকতায় ফিরে আসি। কিন্তু অনেকটা সময় অপচয় হয়। স্বামীজির এর হাত থেকে কি রেহাই পাব না? স্বামীজি বললেন, রেহাই তোমাকেই পেতে হবে এবং কত দিনে পাবে সেত তোমার উপরে নির্ভর করছে। রুটিন মেনে চল তো? অবশ্যই মেনে চলবে। *** *** পাঁচটা বাজে। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা নিভৃতে স্বামীজির সাথে কথোপকথনের এমন দুর্লভ সৌভাগ্য বড় একটা হয় নি। স্বামীজি বললেন চল বাইরে বসি। অনুরাগী ভক্তজন একে একে আসছেন। মনোরম সন্ধ্যা। শহরের প্রান্তে পল্লীবাংলার একখানি খণ্ডচিত্র। স্বামীজি বসে বললেন, 'এখন যেন সব নেমে আসছে; আর সকাল বেলায় সব উঠে যায়।' ভক্তেরা নানা প্রশ্ন করছেন, স্বামীজি উত্তর দিচ্ছেন। এভাবে কথোপকথনে আরও দু'ঘণ্টা কেটে গেল। সাতটা বাজে। সবাই উঠলাম। উঠে চলে আসার আগে স্বামীজির লাইব্রেরী দেখলাম, শোবার ঘর দেখলাম ঘুরে ফিরে। এমন সৌভাগ্য কজনের হয়? আগেরবারও অবশ্য দেখেছি। টেবিলে স্বামীজির মুখোমুখী যে দুটি ছবি ফুলে ফুলে সাজানো, একটি 'সরস্বতী', বাঁ পাশে 'হৈমবতী'— ছবিদুটি তন্ত্রাভিলাষী সাধু সঙ্গ গ্রন্থের প্রণেতা বিখ্যাত শিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা। এবারে পণ্ডিচেরীতে শিল্পীর সাথে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। আসার সময় স্বামীজি সবাইকে নির্মাল্য দিলেন। আমাকেও দিলেন। আর দিলেন সদ্য প্রকাশিত স্বামীজির লেখা একখণ্ড 'বেদান্ত জিজ্ঞাসা'। এটাই ছিল নরেন্দ্রপুরের শেষ দর্শন। এরপর স্বামীজি নানা সমস্যাতে বাড়ি বদল করেন।

বললাম, স্বামীজি, আগামী পরশু শনিবার, কেঁয়াতলায় যাব। স্বামীজি বললেন, 'যেও'। প্রণাম করে বেড়িয়ে এলাম।

সুদীর্ঘ চার ঘণ্টার পুণ্য সান্নিধ্য। এ যে কতবড় সৌভাগ্যের সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এত দীর্ঘ সময়ের সান্নিধ্য কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। এত পেয়েও জীবন পাত্র ভরে নিতে পারলাম না। এটাই দুঃখ। এটাই কি তবে প্রারব্ধ?

যাবার আগে ৭।৫।৭৮ তারিখের চিঠিতে স্বামীজি আশীর্বাদ রেখে গেছেন।

"হাল ছেড়ো না—কোন অবস্থাতেই হাল ছেড়ো না। আত্মকৃপার এই হল মূল কথা। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি রণজিৎ হবেই হবে।

স্নেহাশিষ রইল। ভাল থেকো।

অনির্বাণ"

স্বামীজি চলে যান ৩১।৫।৭৮ তারিখে। যাবার আগে আরও দু'টা চিঠিতে অনুরূপ আশ্বাস রেখে গেছেন। (পথের কথা দ্রষ্টব্য)

*** *** ***

—ঃঃ—

দিব্য মানবই গড়ে তুলবে দিব্য সভ্যতা

রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর ভাবনা ঃ জীবনে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান জীবনকে দিব্য পরিচয় দিয়েছে। মানুষ শুনেছে, জেনেছে বা অনুভব করেছে ব্রহ্মের উপস্থিতিকে। যারা ব্রহ্মের অবস্থানের কথা শুনেছে তারা জেনেছে একথা বলা যায় না। যারা জেনেছে তারা অনুভব করেছে এ কথাও সবক্ষেত্রে বলা যায় না। যারা অনুভব করেছে তারা মানুষী সীমা অতিক্রমে উৎসাহী বা প্রয়াসী তাও বলা যায় না।

এই মানবজীবনে ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করছেন একথা বহু মানুষই নানা ভাবে শুনেছেন। জীবনে তাঁর অবস্থানের সংবাদ নিছক একটা তথ্য হয়েই রয়ে গিয়েছে। এটি নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করার সময় মানুষের কোথায়? মানুষ ব্যাপ্ত হয়েছে, ব্যস্ত রয়েছে নিজেকে নিয়ে। নিজের চাওয়াপাওয়ার খবর মানুষের কাছে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। চাওয়াপাওয়ার হিসেব কষতে আর সরবরাহ করতেই মানুষের

সব রসদ যেন ফুরিয়ে যায়। জীবনের যত ধন মানুষ অর্জন করে, গড়ে তোলে অথবা পায় সবই তার নিজের সেবায় লেগে যায়। মানুষের যত ভাব, যত ভাবনা, যত কল্পনা, যত পরিচয়ের দ্যোতনা, যত রকমের উদ্যোগ ও কাজকর্ম সবই নিজেকে কেন্দ্র করেই।

নিজের জন্যই মানুষ ভাবে। নিজেকে নিয়ে ভাবনার সূত্রপাত হয় যেন নিজের অজানা এক পরিচয় থেকে। মানুষের নিজেকে জানার পর্বটির শুরুতে কতকগুলি আপাত গ্রাহ্য বিষয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। নাম, গোত্র, পারিবারিক পরিচয়ের পাশাপাশি মানুষের নিজস্ব অর্জনকে জানার পর্বটি শুরু হয়ে যায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের জানবার প্রয়াসে প্রথম হল তার নিজস্ব বিষয়গুলি। শিক্ষার পরিচয়, কাজের পরিচয় বড় হয়ে দেখা দেয়। যদি শিক্ষা বা কাজের পরিচয়ে বিশিষ্টতা না মেলে তবে অন্যান্য শৈলী ও গুণপনার পরিচয় আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এছাড়াও রয়েছে দেশ, জাতি বা নিজস্ব গোষ্ঠীর পরিচয়। পরিচয়ের এই পর্যায়গুলি একের পর আরেক যেমন আসতে পারে, তেমনি পারে একই সঙ্গে আসতে।

বিশিষ্টতার খোঁজে তৎপর মানুষ ক্রমে নিজেকে আরও বেশি কবে আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করে। ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় নিছক একটা মানুষ হিসেবে যেমন তেমনি যেন অনেকের মধ্যে থেকেও অনেকের চেয়ে আলাদা। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেক মানুষই আলাদা। কোনও একজনের সঙ্গে অন্যজন একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত নয়। প্রত্যেকের যেমন পরিচয় আলাদা তেমনিই আলাদা তার মান ও দর। মানুষের প্রথম মান ও দর নিজের কাছে তারপর অন্যের কাছে। নিজের কাছে যখন তার বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে তখনই সে চায় সামগ্রিকভাবে সমাজের কাছে, অন্যদের কাছে, জগতের কাছেও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে। এই বিশিষ্ট হয়ে ওঠবার প্রবণতা সব ক্ষেত্রেই রয়েছে।

মানুষই বা কেন, একটি পিঁপড়ের মধ্যেও রয়েছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠবার প্রেরণা। একটি ক্ষুদ্র প্রাণও চায় নিজস্ব বিশেষ অবস্থানকে আরও কতভাবে বিশিষ্ট করে ফেলতে। পিঁপড়েরও বিশ্বাস হয় তার মত, তার জীবন, তার গতি, তার পরিধি সবেরই মধ্যে রয়েছে একটা আলাদা এমন কিছু, এমন স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত এগুলি যে বিশিষ্ট না বলে উপায় নেই। এদের অবস্থান ও পরিচয়ের বিশিষ্টতাকে মেনে নিতে হবে।

বিশিষ্ট হয়ে ওঠার এই প্রবণতাকে জীবনের মৌলিক প্রবণতা বলা যায়। জীবনের মৌলিক প্রবণতা হওয়ার জন্যই বিশিষ্টতার মাত্রা সম্পর্কে জীবন হয়ে ওঠে যথেষ্ট মাত্রায় উৎসাহী। মৌলিক প্রবণতার পিছনে যে প্রত্যয়টি রয়েছে তা হল জীবনকে তার আদি পরিচয়ে আবদ্ধ করা। মানুষের ক্ষেত্রে এটি যেমন সত্য তেমনিই সত্য মানবেতর অন্যান্য জীবনের ক্ষেত্রে।

মানুষের দৃঢ়মূল বিশ্বাস সে মানুষই। তার আছে জন্ম, আছে মৃত্যু। তার আছে স্বপ্নদেখা, হয়ে ওঠা, আছে ব্যর্থতার পসারী হওয়া, ক্রমপুঞ্জীভূত নিজস্ব কর্মধারার প্রতিক্রিয়ার সম্পদকে বয়ে নিয়ে যাওয়া। মানুষ চায় সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে। কী সেই সত্যিকারের মানুষ সে বিষয়ে তার ধারণাটি তৈরী হয় নিজস্ব প্রয়োজন ও অবস্তার নিরিখে।

সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে গিয়ে মানুষ ভুলে যায় তার পিছনে, তার ভিতরে রয়েছে অন্য সম্পদ। মানুষ হয়ত বা শুনেছে, বা আপাতভাবে জেনেছে যে এ জীবনটির শুরুতে যেমন মধ্যের যাত্রাপথেও তেমনি রয়েছেঅনন্ত সম্ভাবনার একটি সম্পদ—যে সম্পদ জীবনকে মানুষী সীমা পার করিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ব্রহ্ম এ জীবনের গড়নেই শুধু নয়, এ জীবনকে লালন করা ও বড় করে তোলার মূল প্রেরণা ও সম্পদ। মানুষ শুনলেও, জানলেও বা বুঝলেও যেন শোনে না, জানে না বা বুঝতে চায় না যে ব্রহ্মই জীবনের আদি এবং অন্তে, ব্রহ্মই এ জীবন।

ভাগবতী সাধনা ঃ জীবনের পত্তনে যেমন তেমনি চলার পথেও আমরা বরাবরই সত্যকে আপাতভাবে গ্রহণ করি। সত্যের আত্যন্তিক সীমায় যাই না। সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে রয়েছে যেমন সত্যপ্রিয়তা, তেমনি একে ধারণ করার পক্ষে রয়েছে সত্যনিষ্ঠা। সত্যপ্রিয়তা ও সত্যনিষ্ঠাকে আমরা কিছুটা বরণ করি কিন্তু এর শেষ অবদি যেতে পারি না। সত্যকে শেষ পর্যন্ত বরণ করা মানুষী ঐতিহ্যে দুর্লভ। সাময়িকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যকে গ্রহণ করাই মানুষের স্বভাব। এ যেন অন্ধকারের সাম্রাজ্যে মাঝে মাঝে সাময়িক আলোর ঝলক। হাজার মিথ্যার মালায় একটি-দু'টি সত্যের ফুল। হাজার মিথ্যা বুদ্ধির মধ্যে যেন সত্যের জ্যোৎস্নাঝলক।

মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে, মিথ্যার প্রশ্রয়। মিথ্যারই ইমারত, যেন জীবন তাকে তিল তিল করে গড়ে তুলছে এবং সেটিই সত্য বলে যেন তার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। মিথ্যার ক্ষমতা রয়েছে নিজেকে সত্য হিসেবে প্রতিভাত করার। মিথ্যা সত্যেরই আকার ধরতে শেখে, ধরে। রাক্ষস বহুরূপী। নানারূপ ধারণ করতে পারে। মিথ্যা রাক্ষস কখনও সত্যরূপ ধারণ করে বিভ্রান্ত করে। মিথ্যার প্রভাব তাই হয়ে ওঠে বহুদূরব্যাপী। মিথ্যার কবলে পড়ে মানুষ সত্যস্নানে যেন তৃপ্ত হয়ে ওঠে। যেন সত্যকেই দেখছি, ভাবছি বা বুঝছি এমনই একটি ভাব এসে যায়।

মিথ্যার মায়াজাল মানুষকেই করেছে নিজ জীবনের সম্রাট। মানুষ নিজেকেই দাঁড় করিয়েছে জীবনের কেন্দ্রে। নিজে রাজা

বলেই আর অন্য রাজার অস্তিত্ব তার কাছে গ্রহণীয় নয়। নিজে রাজা বলেই মানুষ অন্য রাজাকে নিজ স্তরে নিয়ে এসে বিচার করে। তার বিচারে তাই যা কিছু মানুষী, যা কিছু মানবিক তাইই শ্রেষ্ঠ। মানুষী দ্যোতনা শুধু প্রধানই নয়, একমাত্রও হয়ে ওঠে। তাই মানুষ জানে তার মানুষী পরিচয়ই শেষ কথা। তাকে মানুষ হতে হবে। প্রকৃত মানুষ হতে পারলেই হবে তার জীবন সার্থক।

মানুষ হবার এই প্রেরণাই যেন তার ব্রহ্মবিচ্ছেদকে ফুটিয়ে তুলছে। মানুষ যত বেশি মাত্রায় 'মানুষ' পরিচয়ে বিধৃত হতে চেষ্টা করছে তত বেশি পরিমাণে সে তার ক্ষণিক, সাময়িক পরিচয়ের দীপ্তিকে যেন তীব্রতর করে তুলছে। ক্ষণিক এই পরিচয়ের দীপ্তি তার ক্ষুদ্রতারই তীব্রতা। মানবিক চেতনার যে ক্ষুদ্রতাকে বরণ করে, ধারণ করে মানুষ নিজে উঠে দাঁড়িয়েছে তার বিশিষ্টতাই এই তীব্রতা। স্বভাবতই ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, খণ্ডচেতনার অধিকারী মানুষ তার এই খণ্ডচৈতন্যের প্রভাকে যেন আরও তীব্র করে তুলতে ক্রমশ আগ্রহী। খণ্ডচৈতন্যের তীব্রতা বৃদ্ধিই তাই মানুষের অন্তিম অভিলাষ।

এই খণ্ডচৈতন্য নানাভাবে নিজের সীমাবদ্ধতার দ্বারা তৃপ্ত হয়েছে। এটি যেমন দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ তেমনি সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও সত্যের নিরিখে। খণ্ডচৈতন্য খণ্ডজ্ঞানের উদ্ভাস এনে দেয়। খণ্ডজ্ঞানই মানুষকে ক্রমে স্বার্থমুখী ও আত্মসেবী করে তোলে। খণ্ডচৈতন্যবিধৃত মানুষ আপাতমাত্রায় স্থূলস্বার্থ অতিক্রম করতে যখন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখনই জেগে ওঠে তার মধ্যেকার সুপ্ত সূক্ষ্মস্বার্থ। নিজের বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, নিজের বৃহৎ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে আশ্রয় করে থাকে।

ব্রহ্মের কথা মানুষ শুনেছে, হয়ত বা বিশ্বাসে এনেছে বলেও বহুসময়ে ভাবছে, কিন্তু ব্রহ্ম জীবনে অগ্রসর হচ্ছেন না। ব্রহ্ম জীবনকে ধারণ করছেন না। ব্রহ্ম একটি আলাদা হয়েই বিরাজ করছেন। মানুষের নিজস্ব জীবনযাত্রায় ব্রহ্মের সঙ্গে তাই নেই কোন সম্পর্ক, নেই দেখাদেখি। ব্রহ্মের খবর আছে, ধারণা নেই। জীবন মানুষ হয়ে ওঠার তৎপর হবার জন্যই হারিয়েছে ব্রহ্মপথের সন্ধান।

জীবনের মূলেই ব্রহ্ম। তিনি স্বয়ংই হয়েছেন এক মহাপ্রাণ। আর সেই মহাপ্রাণই প্রাণের প্রবাহ এনে দিয়েছে জগতে। মহাপ্রাণ যে প্রাণের প্রবাহ এনেছেন তারই পরম্পরায় মানুষ এসেছে। মানুষ এযাবৎ লালিত জীবনস্রোতে যেন এক প্রধান অবলম্বন। মানুষ জীবনস্রোতের প্রবাহকে নিজমাত্রায় সীমায়িত করে রাখছে। জীবনের ধারাবাহিকতায় মানুষই যেন শেষ কথা, যেন সর্বশেষ অবস্থান। এমন বিশ্বাসই ঘনীভূত হয়েছে যে জীবনের যাত্রাপথের শেষ কথা মানুষ। শেষ পরিচয় মানুষ, মানুষ জীবনকে সবচেয়ে বেশি পরিপুষ্ট করেছে, তাই এখানেই ফুলস্টপ। মানুষেই শেষ।

অথচ মানুষ জরা, মৃত্যুর কবলে। মানুষ তার সৃষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োগে জগৎকে যেন নিজের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। প্রকৃতির সব বিধানের উপরেই সে তার প্রভাব বিস্তারে তৎপর। সে আকাশে উড়ছে, জলের নিচে দিয়ে যাচ্ছে, শীতকে তাপায়িত করছে, তাপকে শীতায়িত। তার প্রকৃতিবিজয়ী রথ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যেন বিশ্বকে জয় করে বিজয়ী হয়েছে।

অথচ সে তার নিজ চৈতন্যের সীমাবদ্ধতার কাছেই পরাজিত। নিজস্বতার নিরিখেই তার হারটি হয়েছে সবচেয়ে রূঢ়। সে হেরেছে জীবনের কাছে। মৃত্যুর অভিযানকে মানুষ পারেনি রুখে দিতে। বিজ্ঞান তার আয়ু বাড়িয়েছে। তার স্বাচ্ছন্দ্যও করেছে বিস্তৃত কিন্তু পারেনি তার অন্তরের পথে অভিযান করতে। বিজ্ঞান মানুষকে ব্যবহারিক জগতের বিজয়টি এনে দিয়েছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার অন্তরের সম্পদকে ঋদ্ধ করতে, উন্মেষ ঘটাতে তার অপরিমেয় আন্তশক্তি?

মানুষ বস্তুতই অসীম সম্ভাবনার অধিকারী। যে চৈতন্যশক্তি এই বিশ্ব চরাচরে প্রাণকে লালন করেছেন তাঁরই উত্তরাধিকারী মানুষ সেই জ্ঞানেরই জাতক বা পূর্ণসত্যকে লালনে সক্ষম, যা পূর্ণ সত্যের মুখোমুখি হতে পারে। মানুষই পারে ব্রহ্মের অঙ্গনে দৃপ্তভাবে দাঁড়াতে, ব্রহ্মপথকে চিনে নিতে। এ মানুষকে প্রথমেই করতে হবে আন্তর্বিজয়ের অভিযান। ভিতরে যে সব রাক্ষস ও পশুরা বসে আছে তাদের মোকাবিলা করতে হবে। মানুষ জাগরণের রথে চড়েইতা পারবে। জাগরণের রথটি তার প্রকৃত পরিচয় ঘটিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে সে নিছকই মানুষ নয়, সে দিব্য।

ব্রহ্মের ধ্বনি বা ছন্দ দিয়ে হয় তাঁর সাধনার সূত্রপাত। ধ্বনি বা ছন্দ ক্রমে রূপ ধারণ করে। রূপের জাগরণে তা হয়ে ওঠে মূর্তিমান। মন্ত্রই ধ্বনিরূপ নিয়ে করে তাঁর আবাহন। প্রথমেই আসে আবাহনপর্ব, এরপর স্তুতি এবং অন্তে সমর্পণ, এ পর্যন্ত ব্রহ্মলাভের পিয়াস-যাত্রা। দিব্যজীবনের প্রয়াস রয়েছে এরও পরে। তাই সাধনার শেষ পর্বটি একটি সংগ্রাম বা খণ্ডের বিরুদ্ধে অখণ্ডের, ক্ষণিকের বিরুদ্ধে শাশ্বতের, সীমিতের বিরুদ্ধে অসীমের, মরণশীলের বিরুদ্ধে অমৃতের। এ হল জীবনে অমৃতসম্পদের জাগরণ। জীবনকে অমৃতে স্থাপন।

সাধনায় আবাহনপর্ব ঃ আবাহনপর্বের সূচনা করেছিলেন ঋক্‌বেদের ঋষিরা। ঋকের সাধনায় অগ্নির চয়ন ও উদ্বোধনপর্ব

দিয়েই শুরু ব্রহ্মের আবাহন প্রক্রিয়া। ব্রহ্মের প্রতি আস্পৃহা সৃষ্টি এই আবাহনের প্রথম কথা। আবাহনের পূর্বেই প্রয়োজন প্রাণসংস্কার, প্রাণকে সংস্কৃত করে তোলা। প্রাণকে সংস্কৃত করতে হলে প্রয়োজন প্রাণের চাঞ্চল্যের শক্তি ও স্থিতির শক্তির উদ্বোধন। প্রাণসঞ্চারের প্রক্রিয়া পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ সাধনমার্গ যেমন দিয়েছেন তেমনি উপনিষদও দিয়েছেন। প্রাণ-অপান-ব্যান্ বায়ু সঞ্চালন ওঁকার সহযোগে মননের সঙ্গে সম্পাদিত হলে সাধকের পক্ষে এখন প্রাণস্ফুরণ হয়ে ওঠে সাবলীল।

প্রাণের স্ফুরণের এই পর্বে প্রাণবায়ুতে বায়ুত্যাগের মাধ্যমে সাধকের আন্তরজগৎকে মার্জনা করার পর্বের সূচনা ঘটে। এই পর্বে সাধক এখন প্রাণের সাধনায় তৎপর। প্রাণের সাধনায় বায়ুগ্রহণ, অপানবায়ু প্রাণাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে। অপানবায়ু প্রাণবায়ুদ্বারা সংস্কৃত প্রাণমন্দিরকে শক্তির উদ্বোধনে উপযুক্ত করে তোলে। শক্তির উদ্বোধনটি হয় ব্যানবায়ুর প্রাণাভ্যন্তরে বায়ু ধারণের মাধ্যমে।

প্রাণের প্রক্রিয়ায় প্রথম জাগরণটি হয় অভীপ্সার। সাধনার পর্বে এই অভীপ্সাই সাধকপ্রাণের প্রথম ব্রহ্মবাহন। সাধকের নিজ অস্তিত্বের মধ্যেই রয়েছে যে ব্রহ্মমন্দির তার দিকেই এখন সাধকের অভিযানপর্বটির সূচনা হবে। ওঁ-এর সাধন দিয়ে অগ্নির উদ্বোধনপর্বে সাধক প্রাণসঞ্চার করে অভীপ্সার দীপ্তি বাড়িয়েছেন। অভীপ্সা যত বাড়বে ততই হবে আত্মশক্তির উদ্বাধন। যে শক্তির দ্বারা সাধক তাঁর সাধনপথে চলবেন তার উৎসমূল রয়েছে সাধকের নিজ অস্তিত্বের মধ্যেই।

ব্রহ্মই সাধনশক্তির মূল উৎস। সাধকের সামর্থ্য, সাধনার শক্তি উভয়ই তাঁরই। তাঁরই শক্তির তাগিদ রয়েছে সাধকের সাধনপথে। তিনি স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন এই জীবনে, ব্রহ্মমন্দিরই এই জীবনের সাধনক্ষেত্র। ব্রহ্মমন্দিরটি রয়েছে জীবনের সব অংশে। জীবনের সমস্ত সম্পদ ও সামর্থ্য এই ব্রহ্মমন্দির থেকেই আহৃত। প্রাণপ্রক্রিয়া যদি এই মন্দিরের জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয় তবেই জীবন হয়ে ওঠে দিব্যের আধার। জীবন তার বাহ্যিক পরিচয়ের মাত্রাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গড়ে তোলে এক আত্যন্তিক পরিচয় পরম্পরা। আত্যন্তিক পরিচয়ের মূল তাৎপর্য হল জীবনের কেন্দ্রে তাঁকে উপলব্ধি করা।

তাঁকে উপলব্ধিরও বহুমাত্রা রয়েছে। মনের অধিকারে বিষয়টি যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে উপলব্ধি করা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। মন বিভ্রান্ত করে। মনের ধর্মই হল আরোপ। মনের সংস্কার ও ঐতিহ্যজাত যে রঙ রয়েছে সেই রঙে মন রাঙিয়ে থাকে। মন যখন কোন কিছু দেখে বা দেখবার জন্য প্রয়াসী হয় তখন তার প্রয়াসটি নিজব রঙেই সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ মনের নিজস্বতা নিয়েই মন সবকিছুর বিচার ও পর্যালোচনা যেমন করে তেমনি সাধনমার্গেও মন নিজের মাত্রা আরোপ করে থাকে।

মনের রয়েছে বিভিন্ন স্তর। চিত্ত, মানস, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এই চারটি স্তরে মনের বিন্যাস। চিত্ত মনের অতীত নিয়েই কারবার করে। অতীতের চর্চা, পর্যালোচনা ও অতীত থেকে নেওয়া অবসাদ বা প্রেরণা চিত্তের কাজ। অতীতের কারবারী। অতীতের সংস্কার, ঐতিহ্যই যেন এর কাছে প্রধান। তাই চিত্ত অতীতের কারবারী। অতীতের সংস্কার, ঐতিহ্যই যেন এর কাছে প্রধান। তাই চিত্ত সবসময়েই সাধকের নিজস্ব অতীত যেমন তুলে ধরে তেমনি তুলে ধরে অন্যান্য ক্ষেত্রের অন্বিত অতীতও। সামগ্রিকভাবে অতীতের বন্ধন গড়ে তোলে চিত্ত। চিত্ত আবার উন্মোচন করতে পারে তা জ্ঞানসম্ভার। যে জ্ঞান একসময় অর্জন করেছিলেন সাধক, সুপ্ত সেই জ্ঞানের এখন উদ্বোধন করবেন তিনি চিত্তের সহায়তায়। চিত্তের প্রয়াস এক্ষেত্রে খুবই সদর্থক। চিত্ত এখানে সাধকের সাহায্যকারী, সাধককে তাঁর সাধনপথে সঠিক দিকনির্দেশ করতেও চিত্ত সাহায্য করে।

মনের স্বাভাবিক ক্ষেত্র হোল মানস। মানসক্ষেত্রেই মন তার নিজস্ব প্রভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে। মানস মনকে যেমন বহুপথে, বহু বিষয়ে নিয়ে যায়, তেমনি আবার এক পথ, একের সাধনাতেও নিমজ্জিত করতে পারে। মানস যেন মনের স্বক্ষেত্র। ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে মানসপট। ব্যক্তির নিজস্ব মননের ক্ষেত্রেও যেন মানস খুব উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। মানসই সাধনপর্বের সূচনাটি স্পাদন করে। শুরুতে যেমন সাধনপর্বে যে প্রতিজ্ঞা, যে লক্ষ্য থাকে তা মানসসম্নাত বা মানসনিয়ন্ত্রিত। মনের অধিকারেই সাধনপ্রক্রিয়ার সূচনা হয়। মনই যেন প্রথম পর্দাটি খুলে দেয়।

মানস যখন পর্দাটি খুলে দেয় এসময়েই আসে বুদ্ধির প্রভাব। বুদ্ধিই এখন পরিচালক শক্তি। বুদ্ধির পরিচালনাধীন ব্যক্তি এখন সাধন পথে থাকবেন না অন্যপথে যাবেন সেটি প্রথমে বিচার করবেন। বুদ্ধিই ঠিক করে দেয় গতির অভিমুখ, গতির মাত্রা এবং গতির গুণাবলী। আগেই বলা হয়েছে ব্যক্তির অতীত সংস্কার এবং পরম্পরী এখন তার অধ্যাত্মপথকে যেন আচ্ছন্ন ও অধিকার করে বসে। সাধকের অজান্তেই অথবা তাঁর সচেতন প্রয়াসে মনের প্রভাব এসে পড়ে সাধনপথে। মনই তখন সাধনপথকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। বুদ্ধির প্রথম প্রয়াসটি মানুষী আবর্তেই সাধনপথকে সীমাবদ্ধ রাখা। মানুষী আবর্তে সাধনপথকে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে মনের নিয়ন্ত্রণেই সেটি করতে হয়। মানবিক বুদ্ধির প্রয়োগে তাই অধ্যাত্মমার্গটি মানবিক দ্যোতনা সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিরও বিবর্তন আছে। যে বুদ্ধি ব্যক্তির অহংবোধে এবং ব্যক্তির মানবিক অস্তিত্বের সেবায় তৎপর তার পক্ষে ভগবৎ অভীপ্সা

যেন দূরগত কোন প্রয়াস। এই বুদ্ধি বিভ্রান্ত করে। হিসেব কষতে অভ্যস্ত এই বুদ্ধি মানুষকে শুধুমাত্র যেন লেনদেনের একটি জীবন্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যে বুদ্ধি মানুষের নিজস্ব স্বার্থ ও পরিচয়ের সীমা পেরিয়ে পরমার্থের দ্যোতনা এনে দেয় সেটিই প্রকৃত বুদ্ধি—'সা চাতুরী চাতুরী'। যিনি ব্রহ্মকেই অবলম্বন করেছেন তিনিই বুদ্ধিমান। যিনি ব্রহ্মকেই একমাত্র করেছেন তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান। বুদ্ধির দিব্য জাগরণ এখানেই।

বুদ্ধির দিব্য জাগরণেই হয় প্রজ্ঞার প্রকাশ। প্রজ্ঞা এখন রূপধারণ করে দিব্যের। প্রজ্ঞার উন্মেষ যত গাঢ়, যত নির্দিষ্ট হয়ে উঠবে, মনের তত লয় প্রাপ্তির দশা। প্রজ্ঞার শাশ্বত পরশ মনের সমস্ত অবলম্বনকে ক্রমে গলিয়ে দেয়, ধুয়ে দেয়, হয় মনের নাশ। এখান থেকেই শুরু হয় অতি-মানস বা মনোতীতের যাত্রা। মনাতীত শুধু মনের পরবারই নয়, এটি একটি নতুন মাত্রার, নতুন পরিচয়ের মন। এটি শাশ্বত মন। শাশ্বত মনই দিব্যচৈতন্যের ধারক।

ঈশ্বরে সমর্পিত দিব্য মানুষ ঃ এই শাশ্বত মন দিব্যচৈতন্যকেই ধারণে তৎপর হয়। শুধুমাত্র ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠে এই যাত্রা। এ যাবৎ মানব পরিচয়ের যে ক্ষুদ্রতা বিরাজ করছিল তার সবটাই যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ব্যক্তির ঘটে রূপান্তর।

এটি যেন প্রজাপতির প্রজাপতি হয়ে ওঠা নানা রূপের স্তর ধরে। বাহ্যিক খোলসটিতে নয়, রূপান্তরের যাত্রাটি শুরু হয় অন্তরজগতে। পুরোনো মনের খোলসগুলি ঝরে যায়। প্রথমেই ঝরে যায় পাশবিক মনের আবর্তটি। মনের যে পাশবিক আবর্তটি মানুষের পরম প্রিয় ছিল, যেটি মানুষকে নিয়ত পরিচালিত করে এসেছে, তা ঝরে যায়। ঝরে যায় কারণ এটি ঝরারই জন্য নির্দিষ্ট। এটি ঝরে না যাওয়া পর্যন্ত মনের মানবিক পর্যায় শুরু হয় না। মনের পাশবিক বৃত্তিগুলির পরিচয়— তার হিংসা, দ্বেষ, যেনতেন ভাবে স্বার্থপূরণের তৎপরতা এবং অন্যের বিষয়ে একেবারেই না ভাবা।

এরপর যখন মনের মানবিক পরিচয়ের পর্ব শুরু হয় সেসময় মন কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হয়। অন্যের দিকটাও দেখে। মানবিক গুণাবলীও ফুটে ওঠে, যেমন, ভালবাসা, সহনশীলতা, উদারতা, সত্যময়তা, দানশীলতা ও ত্যাগপ্রবণতা। মানুষী পর্যায়ে স্থূল স্বার্থকে পরিহার করে মন সূক্ষ্মে যাত্রা শুরু করে। স্থূল স্বার্থ মনের কোণে আর বাসা বাঁধে না, এখন মানুষ বড় হতে চায়, বিস্তৃত হতে চায়। কিন্তু সব বিস্তার প্রয়াসের লাগাম থাকে তার সূক্ষ্ম আত্মপ্রীতির মধ্যে। সূক্ষ্ম আত্মপ্রীতিই সব বিস্তারের কেন্দ্রে বর্তমান থাকে।

মানবিক পর্যায়েই রয়েছেন বিশিষ্ট জনরা, উন্নতরা। এখানে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার, চোখে পড়ার, গণ্য হবার, স্বীকৃত হবার প্রবণতাটি সতেজ থাকে। এরপরই হয় মনাতীতের যাত্রা। মানব মনের অবস্থা থেকেই শুরু হয় ঈশ্বরে নিবেদিত হবার প্রয়াস। এ যাত্রা শাশ্বতের, এ যাত্রা যেন উন্মুক্ত দিগন্তে মহাশূন্যের পথে।

ঈশ্বরে সমর্পিত হবার প্রয়াসী হয়ে ওঠে এ মন। ঈশ্বরে সমর্পনের প্রয়াসে মনের মধ্যে ফোটে ঈশ্বরী গুণের আভাস। মনাতীত মন এখন গুণান্বিত। এ মনকে আর চেনা যায় না। এটিই শাশ্বত মনের প্রতিভাস। এই অবস্থায় মন আর প্রাক্তনকে আঁকড়ে থাকে না। চিত্ত এখআনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, চিত্ত হয়ে প্রসাদী। চিত্ত যত ঈশ্বর প্রসাদী হয়ে উঠবে ততই জাগতিক উপাদানে সম্পৃক্ত অতীতকে বর্জন করবে। চিত্ত আহরণ করে নিয়ে আসবে সেই শাশ্বত অতীতকে যার শুরু হয়েছিল স্বয়ং মহাপ্রাণের যাত্রায়।

মানস এখন আর মানবমানস নয়। সাধারণ, স্বাভাবিক মনঃক্রিয়া নয়, এখন হবে বিশিষ্ট মন। এ মন যে মজে গিয়েছে ভাগবতী রসে, ভাগবতী প্রেরণায়। তাই এ মন স্বতন্ত্র। এ মন অন্য প্রাণের দ্যোতক। এ মন মানবী প্রাণকে যেন অতিক্রম করে মহাপ্রাণের সঙ্গেই যুক্ত করে গড়ে তুলতে তৎপর এক অখণ্ড প্রাণধারাকে।

বুদ্ধি এখন ভাগবতী। ভাগবতী বুদ্ধির আলোয় শুধুই ঈশ্বরের প্রতিভাস। বুদিধ সেই চর্চারই চয়ন করে যা ক্রমাগতভাবে সাধককে ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলে। ঈশ্বরপ্রয়াসী সাধক এখন ঈশ্বরের আঙিনায় এসে হাজির। এ বুদ্ধি সাধকের দিব্যায়িত হবার বুদ্ধি।

প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত সাধক এখন ঈশ্বরের ভাবে ও জ্ঞানে ক্রমে ভরপুর হতে চলেছেন। চিদানন্দ ভাবে ও রূপে বিভোর সাধক এখন এই জগতেই অন্য জগতের অধিবাসী। জগতে বাস তার পরিপূর্ণ মাত্রায়। এ যাবৎ যে খণ্ডের চারণ ছিলেন সাধক তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং নিজেকে স্থাপন করেছেন অখণ্ডের ঘরে। সাধক এখন অখণ্ডের অভিলাষী, অখণ্ডের স্পর্শে অখণ্ডাভিমুখী। ইনি এই জগতেই, এই মানবতনুতেই দিব্য হয়ে উঠেছেন।

দিব্যমানুষের উদ্ভব প্রয়োজন এই জগতেই। কতিপয় মহাপুরুষই দিব্যজীবন যাপন করবেন, তাই নয়। দিব্য হয়ে উঠতে হবে মানুষকে। বহু মানুষ ক্রমে তাদের মানবিক পরিচয়ের বাহ্যিক মোহকে পরিত্যাগ করে উঠে আসবেন দিব্য অঙ্গনে। দিব্যপ্রজ্ঞায় ভাস্বর হয়ে উঠবেন তাঁরা। গড়ে তুলবেন একটি দিব্যসমাজ, দিব্যপরম্পরা ও দিব্যসভ্যতা। দিব্যজীবন যাপন করবেন এই জগতে। খণ্ডের মধ্যেই হয়ে উঠবে অখণ্ডের বিকাশ, মরণশীলের মধ্যে অমৃতের।

—ঃঃ—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন 4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে (কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st March 2024
Falgun–1430
Vol. 21. No. 11

REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৩রা মার্চ, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১০ই মার্চ, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৭ই মার্চ, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৪শে মার্চ, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ৩১শে মার্চ, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.